ভাল্লুকদাদার গল্প

সুকুমার দে সরকার

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ১৯৫৯
কার্তিক ১৩৬৬

প্রকাশ করছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

ছেপেছেন
গণেশপ্রসাদ সরাফ্
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৭।১ বিন্দু পালিত লেন
কলকাতা-৬

ছবি এঁকেছেন
শৈল চক্রবর্তী

ভাল্লুকদাদার গল্প

পর্বত একটা মূষিক প্রসব করল।

আর সেই ইঁদুরটাকে প্যাঁচায় নিল সাঁঝের ঝোঁকে। এমন কিছু বড় পাহাড় নয়, কিন্তু যতদূর চোখ যায়—শান্ত সমুদ্দুরের ঢেউগুলো যেন হঠাৎ পাহাড় হয়ে আকাশে লাফিয়ে উঠে নেমে গেছে। সবুজ পাহাড় বনময়। রুদ্র বৈশাখী রাতে পাহাড়েরা দাবানলের হার পরে ঝলমলিয়ে ওঠে। আষাঢ়ের নীলাম্বরী আকাশের কালাপেড়ে মাথায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঢল-নামা পাহাড়ি নদী ঐরাবত পাথরদের ভাসিয়ে নিয়ে এসে হারিয়ে যায় বসন্তে বনের গাছা-আগাছাব ভিড়ে। শিরিষের বেগুনি ঝুমকো ফুল ঝামরে পড়ে। তীব্র সুগন্ধ, ঝরে-পড়া মহুয়া ফুলের সুবাস কেঁপে কেঁপে বাতাসে ডাক দিতে-দিতে ভেসে যায়। লাল থোকা-থোকা ডুমুরে গাছ ছেয়ে যায়।

ফুলের রঙে রঙে আসে প্রজাপতিরা। গন্ধে গন্ধে মৌমাছি আর মৌটুসি পাখির দল। মহুয়া ফুলের তীব্র গন্ধে দূর পাহাড় পার হয়ে আসে শ্লথ ভাল্লুক। আর ফলের লোভে লোভে কাঠবেড়ালি, হরিণের দল আর উড়ুক্কু শেয়াল। হরিণদের পিছু পিছু আসে বন-কুকুরের দল আর হায়েনা।

শ্লথ ভাল্লুক কানে কম শুনলে, চোখে কম দেখলে আর তিন-তিরিক্ষি মেজাজের হলে কী হবে, লোক ভাল। মহুয়া-তলায় মৌমাছিদের সঙ্গে দেখা। মৌমাছিরা ব্যস্ত লোক। বোঁও করে আসে আর ভোঁও করে চলে যায়। মৌ নেওয়া,

চাক গড়া—কত কাজ তাদের। মহুয়া-তলায় মৌফুল শুঁকে শুঁকে খেতে খেতে ভাল্লুক বলল, 'হাঁউ মাউ খাঁউ, মাছির গন্ধ পাঁউ!'

শ্লথ ভাল্লুকের গন্ধ-নাক বড় ছুঁচোল।

মৌমাছিরা এক মিনিট হাওয়ায় থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'মাছি নয় মাছি নয়, মৌমাছি।'

'অ্যাঁ, কী বললে?' ভাল্লুক কান খাড়া করে শুধোল,—'বৌ মাসি?'

'না না, মৌমাছি।'

'অ—অ—বুঝেছি, ভোঁ বাঁশি।'

'ধুত্তোর ভাল্লুক-দাদা', মৌমাছিরা বলল, 'কানের মাথা না-হয় খেয়েছ, চোখে না-হয় পাহাড় ছাড়া কিছু পড়ে না, কিন্তু নাকে কি উইপোকা কামড়ে দিয়েছে? গন্ধ পাচ্ছ না?'

আকাশে নাক তুলে শুঁকে শুঁকে ভাল্লুক বলল, 'ও, তাই বল! মৌমাছি! তা বাছারা, বাচ্চারা সব ভাল তো?'

'বাচ্চা এখনও হয় নি। সবে চাক বাঁধবার ভিত গাড়া হয়েছে।'

'বেশ বেশ। তা ঠিক মাপজোখ করে হয়েছে তো? জলে ভিজবে না? হাওয়ায় দুলবে না? কোথায় হচ্ছে এবার চাক?'

'কিচ্ছু ভেবো না ভাল্লুক-দাদা। ঐ পাহাড়ের পাথরের খাঁজে বেশ মাপজোপ করে চাক দেওয়া হচ্ছে। মৌমাছিদের মত কারিগর কে আছে?'

'আছে গো, উইপোকারা আছে।'

'উইপোকা!' মুখ বেঁকিয়ে মৌমাছিরা বলল, 'তারা আবার কারিগর কী? তারা তো পোকা, ছোট্ট!'

'কিন্তু ছোট্ট হলে কী হয়! উইপোকাদের চোখে আছে পাহাড়ের স্বপ্ন। পাথরের পাহাড় দেখে তারা গড়ে মাটির পাহাড়।'

'হুঁঃ, উইপোকা!' মৌমাছিরা মুখ বেঁকিয়ে বোঁও করে চলে যায়। শ্লথ ভাল্লুক শুঁকে শুঁকে গাছতলার মহুয়া ফুলগুলো শেষ করে আনতে থাকে।

* * *

পত্রমোচী বনের বনতলে ঝরে পড়ে থাকে ঝরা পাতা। সবুজ রোদে জলে সার হয়ে আবার গাছের খাদ্য হয়। কখনও কোন দুষ্টু ঘূর্ণি হাওয়া ঝড়ের মত গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে পড়ে পাতার রাশ পাক খাইয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলে। তারপরে খেলা শেষ হলে, একরাশ পাতা মাটি জড়ো করে ফেলে ঘূর্ণিবেগে বেরিয়ে যায়। মরা পাতা জলে পচতে থাকে।

এই রকম একটা পাতার স্তূপের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভল্লুক থমকে দাঁড়াল।

'হাঁউ মাউ খাঁউ, কিসের গন্ধ পাঁউ?'

ঝরা পাতার ভেতর থেকে সুড়-সুড় সারে বেরিয়ে এল কয়েকটা শাদা শাদা উইপোকা।

'ভাল্লুক-দাদা, ভাল্লুক-দাদা, আমরা উইপোকা।'

'অ্যাঁ, কী বললে,—মুই বোকা?'

'আঃ, ভাল্লুক-দাদা, কানের মাথা না-হয় খেয়েছ, চোখে না-হয় পাহাড় ছাড়া কিছু পড়ে না, কিন্তু উইপোকাদের মিষ্টি গন্ধও কি নাকে যায় না? নাকে কি মৌমাছি কামড়ে দিয়েছে?'

অ, উইপোকা! তা বাছারা, বাচ্চারা সব ভাল তো?'

উইপোকারা বলল, 'বাচ্চা-কাচ্চা এখনও হয়নি, সবে ইমারতের

মাপজোক হচ্ছে। ঝরা পাতার আঠা আর ঝুরো মাটি দিয়ে পাকা ভিত দেওয়া হল।'

ভাল্লুক বলল, 'কোন্ পাহাড়ের নক্সা হল এবার ?'

'দেখবে ভাল্লুক দাদা, দেখবে এবার। এমন পাহাড় গড়া আর দেখনি কখনও। ভেতরে হবে কত সুড়ঙ্গ কত থাক আর কত ঘর !'

'বেশ বেশ,' ভাল্লুক জিব চেটে বলল, 'বেশ বড় করে গোড়ো কিন্তু। অনেক ছেলেপুলে—মস্ত লোকালয়—কী বল ?'

উইপোকারা গোঁফে তা দিয়ে বলল, 'তা তোমার আশীর্বাদে ভাল্লুক-দাদা আমরা বনের গাছকে গাছ ঝাঁঝরা করে দিয়ে উই-শহর বানিয়ে ফেলতে পারি।'

'অমন কাজটি কোরো না !' ভাল্লুক তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'বন গেলে থোকা থোকা মিষ্টি ডুমুর ফলবে কোথায় ? মহুয়া ফুল ঝরে পড়ে গন্ধে মৌমাছিদের ডাকবে কে ? রঙের বিদ্যুৎ চমকে প্রজাপতি না এলে পলাশ শিরিষ ফুল ফুটবে কেন ? উড়ুক্কু শেয়ালেরা এসে গাছতলায় ফল না ছড়ালে হরিণেরা খাবে কী ? তোমাদের ভাল্লুক-দাদার কথা না-হয় ছেড়েই দাও। আর হরিণ না এলে শেয়াল, বন-কুকুর ও হায়েনাদের খাওয়া হবে না।'

ভাল্লুক-দাদা ভাল লোক। কত দেখেছে, কত জানে !

* * *

দিনের বেলায় সুয্যিঠাকুর যখন পাটে বসেন, পাহাড়-ঘেরা সবুজ বন যখন ঝিমঝিম করতে থাকে, পাহাড়-ঝরনায় সুয্যি-ঠাকুরের আলো রঙ-তুলি দিয়ে রামধনু আঁকে—শ্লথ ভাল্লুক পাথরের আড়ালে বসে ঝিমোয়। ঘরে ঢেউ-খেলানো পাহাড়ে

মাথায় মেঘের ছায়া। পলাশ শিমুল শিরিষ ফুলে বনের ফাগুয়া শুরু হয়ে যায়। জলার থেকে ভেসে আসে পাখির ডাক কত-রকম। মাঝে-মাঝে ভেসে আসে বন-কুকুরদের ঘেরাও-করা ডাক আর হরিণের দৌড়ের শব্দ। হায়েনাগুলোর সাবধানী হাসিও ভেসে আসে মাঝে-মাঝে—হা! হা! হা হা! চ্চি! শিয়া! শিয়া!

শ্লথ ভাল্লুক ঘুমিয়ে পড়ে। একেই তো শ্লথ ভাল্লুক কানে কম শোনে আর চোখে কম দেখে, তার ওপর ফলটা মূলটা আর পেট পুরে জল খেয়ে ঘুমোলে এই বন্য পৃথিবী তার কাছে মিলিয়ে যায়। ভাল্লুক-দাদার ঘুমটা কিছু গাঢ়।

দুটো হায়েনা কি করে সেদিক পানে এসে পড়েছিল। ভাল্লুকটা নড়েও না চড়েও না। মরে গেছে নাকি? হায়েনা-গুলোর চোয়ালে আর কাঁধে জোর থাকলে কী হবে, আসলে তারা মহা কাপুরুষ। পরের শিকারে ভাগ বসিয়ে আর পচা পড়া মাংস খেয়ে বন সাফ করে ফেলে। কিন্তু রসিক লোক তারা। আসলে শিকারীকে মহা গোলমেলে হাসি হেসে ভাগিয়ে দেয়, আর বেওয়ারিস মরা জানোয়ার দেখলে একচোট হেসে নিয়ে দেখে সত্যি মরা কি না।

ভাল্লুক-দাদাকে দূর থেকে দেখে হায়েনা-দুটো থমকে দাঁড়াল। তারপর একজন হেসে উঠল, 'হা! হা! হা! চ্চি! শিয়া! শিয়া!'

আর একজন জবাব দিল, 'গুড্ডা! গুড্ডার! গ্‌র্‌র্‌! গ্‌র্‌রা! হা! হা! শিয়া!'

ভাল্লুক-দাদা নড়েও না চড়েও না।

একটা হায়েনা এগিয়ে আসে, 'হা! হা! হা! চ্চিয়া!'

কানের কাছে অমন বিকট হাসি শুনে ভাল্লুকের ঘুম ভেঙে যায়। শ্লথ ভাল্লুক চমকে গেলে অমন তিরিক্ষি মেজাজের লোক নেই বললেই চলে। অন্য জানোয়ার চমকে উঠলে প্রথমেই পালাবার কথা তার মনে আসে, সে যত বড় জানোয়ারই হোক : কিন্তু শ্লথ ভাল্লুক চমকে উঠলে আক্রমণ করবেই।

তাই ভাল্লুক-দাদা চমকে জেগেই দু-পায়ে দাঁড়িয়ে উঠল। তার ছোট নজরে হাতের কাছেই পড়ল প্রথম হায়েনাটা। আর হায়েনাটা লাফ মেরে পেছিয়ে যাবার আগেই পড়ল ভাল্লুক-দাদার বিরাশি সিক্কার চারমণি এক চড় তার কাঁধে। অন্য কাঁধ হলে ভেঙেই যেত, কিন্তু হায়েনার কাঁধ বড় জোরালো। ভাল্লুকের নখে তার কাঁধ ফালা-ফালা হয়ে গেল।

হায়েনা-দুটো নিমেষে হাওয়া।

বনের ভেতর থেকে ভেসে আসছে—'গুড্ডা! গুড্ডার্! চ্চিয়া! শিয়া! শিয়া!'

হাসছে কি কাঁদছে বোঝা গেল না।

ভাল্লুক-দাদা গুটিশুটি মেরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

* * *

সাঁঝের ঝোঁকে পৃথিবী যখন আদিম অনাদি মহাশূন্যে ঘুরতে ঘুরতে সুয্যিঠাকুরের দিকে ঘোমটা টেনে দিতে থাকে, বাবুই পাখিরা বাসায় ফেরে, বন নিঝ্‌ঝুম হয়ে আসতে থাকে, প্যাঁচা যখন ইঁদুর ধরতে বার হয়—ভাল্লুক-দাদাও রোঁদে বার হন।

মৌমাছিরা সেদিনের শেষ ফুলের মধু নিয়ে ফিরছিল, তাদের সঙ্গে দেখা।

'কী গো মৌমাছিরা? চাক কতদূর?'

'হয়ে গেছে ভাল্লুক-দাদা। কী চাক গড়েছি এবার, আর কত মৌ!'

'কিসের মৌ গো?'

'সে কত কী! মহুয়া ফুলের সুবাস দেওয়া, পলাশ ফুলের রঙ মেশানো, শিরিষ শিমুলের স্বাদ মেশানো আশ্চর্য মধু ভাল্লুক-দাদা, মৌমাছি ময়রার হাতে গড়া!'

ভাল্লুক বলল, 'ব্যস, এবার কেল্লা ফতে!'

* * *

পথে পড়ে উইটিপি। বেড়েই চলেছে, ঢেউ-খেলানো মাটির পাহাড়। ভাল্লুক-দাদা শুঁকে শুঁকে বলল, 'বলি ও উইপোকার বাছা, বাচ্চারা কেমন হল এবার?"

উইপোকারা হেসে বলল, 'তা তোমার আশীর্বাদে বড় হয়ে বাছারা বন ছেয়ে ফেলবে।'

ভাল্লুক বলল, 'কেয়াবাত! কেয়াবাত!'

* * *

রাতের অন্ধকারে বন নিঝ্ঝুম। কিন্তু কোন অসময়ে কোন রাতে যদি বিদ্যুৎ চমকে যায়, হাজারটা রাত-চরা চোখ যেন জ্বল-জ্বল করে ওঠে বনের ভেতর। তবু সব নিশ্চুপ। শুধু থোকা থোকা ফল-ফলা ডুমুর গাছটায় যেন নিঃশব্দের হাট বসে গেছে।

ভাল্লুক-দাদা ডুমুরতলায় এসে আকাশে নাক তুলে বলল, 'হাঁউ মাউ খাঁউ, বাদুড়ের গন্ধ পাঁউ!'

গাছের ওপর থেকে মাথা নিচু করে ঝুলতে ঝুলতে অসংখ্য জবাব এল, 'আমার উড়ুক্কু শেয়াল!'

'অ্যাঁ, কী বললে,—খিড়কি দেয়াল?'

'না, না। ভাল করে শুঁকে দেখ।'

'হুঁ! মিষ্টি ডুমুর আর বাদুড়ের গন্ধ।'

'না গো, আমরা উড়ুক্কু শেয়াল।'

ভাল্লুক বলল, 'বললেই হবে? তোমরা ফল-খেকো বড় বাদুড়।'

উড়ুক্কু শেয়ালেরা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, 'দু-পেয়ে মানুষদের বলে দিও না ভাল্লুক-দাদা। তারা জানে আমরা উড়ুক্কু শেয়াল। উড়ুক্কু শেয়ালেরা বেজায় পণ্ডিত।'

'আচ্ছা আচ্ছা, পণ্ডিতেরা,' ভাল্লুক জবাব দিল,—'কিছু ফল ফেল দেখি।'

ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করে পাকা ডুমুর মাটিতে পড়তে লাগল।

* * *

চাঁদ উঠল বনের মাথায়। চাঁদের পাণ্ডুর আলোয় বন মায়া মেখে ঝিমঝিম।

উইঢিপির সামনে এসে এক থাবড়ায় ঢিপির ভেতর একটা গর্ত করে ফেলল শ্লথ ভাল্লুক। তারপর সেই গর্তে বুক ভরে ফুঁ দিল। হুস্‌-হুস্‌ করে ধুলো উড়ে গেল।

উইপোকারা ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল, 'কী করছ ভাল্লুক দাদা! এ কী করছ!'

ভাল্লুক বলল, 'দেখ না!'

তারপর গর্তের ভেতর লম্বা জিবটা ঢুকিয়ে দিয়ে হুস্‌-হুস্‌ করে শুষতে লাগল। আর ছানা-পোনাশুদ্ধ উইপোকারা ভাল্লুকের মুখের ভেতর চলে আসতে লাগল।

'এ কী করছ ভাল্লুক-দাদা! তুমি যে আমাদের বাচ্চাশুদ্ধ খেয়ে ফেলছ!'

ভাল্লুক বলল, 'তোমরা বড় বাড় বেড়েছ !'

*　　　*　　　*

মহাশূন্যে ঘুরতে ঘুরতে মুখের ঘোমটা সরিয়ে নিচ্ছে পৃথিবী। ঊষার লাজুক লাল আভা লেগেছে গালে।

শ্লথ ভাল্লুক খুঁজে খুঁজে পাহাড়ের খাঁজে মৌচাকটাকে বার করল। চারমণি এক থাবড়ায় ভেঙে পড়ল মৌচাক। আর সেই চাকে মুখ গুঁজে দিয়ে শুষে শুষে খেতে লাগল ভাল্লুক।

'বোঁ-ও-ও !' রুখে বেরিয়ে এল একদল মৌমাছি সৈন্য।

'একি ভাল্লুক-দাদা !'

'হুম !'

'তুমি চাক ভাঙলে কেন ? আর আমাদের মধু খাচ্ছ কেন ?'

ভাল্লুক বলল, 'খাসা মধু ! চাক ভেঙে মধু না খেলে এত মৌমাছি জন্মাবে যে বন ভরে যাবে। আর, সব মৌমাছি যদি ফুলে ফ্লে বসে, তাহলে সব ফুল ফল হয়ে যাবে। আর সেই ফলের বীজে এত গাছ জন্মাবে যে গাছের ভিড়ে বন ভরে যাবে !'

মৌমাছিরা বলল, 'তাহলে তোমায় কামড়াব !'

'কামড়াও না !' চাকে মুখ গুঁজে ভাল্লুক জবাব দিল।

আর মৌমাছিরা ভাল্লুককে কামড়াতে লেগে গেল। কিন্তু বড়-বড় মোটা-লোমওয়ালা ভাল্লুকের শরীরে মৌমাছিরা হুল ফোটাবে কোথায় ?

চাক-ভরা মধু শেষ করে আকাশে মুখ তুলে ভাল্লুক বলল, 'আঃ, কী মিষ্টি !'

মৌমাছিদের সেনাপতি বলল, '—ভাল্লুক-দাদার নাক !'

আর সঙ্গে-সঙ্গে ভাল্লুকের নাকে এসে বিঁধল হুল। চার পা তুলে চারমণি শ্লথ ভাল্লুক মারল ছুট। একেবারে জলার জলে

যেখানে ময়ূরপঙ্খী সারে হাঁসেরা বেরিয়েছে সকালকে ডেকে নিতে, সেই জলে ডুব দিল ভাল্লুক।

হেমন্ত শেষ হয়ে গেল। সুয্যিঠাকুরের চোখ ঠিকরে উঠেছে। আগুন সেই চোখে। মাঝে-মাঝে দমকা বাতাস ক্ষেপে আসে বনে। আর গাছে-গাছে ঠোকাঠুকি লাগে, ঘষা লাগে।

* * *

রাতের আঁধারে শ্লথ ভাল্লুক পা চালিয়েছে। পেছনে তার চেনা বনের পাহাড় দাবানলের মালা পরে ঝলমল করছে। সমুদ্দুরে বয়ে চলেছে অগ্নিময় ধোঁয়া। সেই গরম ধোঁয়া সমুদ্দুরের ঠাণ্ডা ঢেউ থেকে শুষে নেবে জলকণা। ধোঁয়া মেঘ হয়ে কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে ঊনপঞ্চাশ পবনে ভর করে ধেয়ে আসবে আবার বনের মাথায়। গাছেরা মাথা নেড়ে চাইবে জল। কচি পাতা হলুদ সবুজ হয়ে উঠবে আবার। পলাশ শিমুল রাঙিয়ে দেবে বন। আসবে মৌমাছিরা মহুয়া ফুলের তীব্র সুগন্ধে। ফুটবে থোকা-থোকা লাল ডুমুর। উড়ুক্কু শেয়ালেরা আকাশে উড়ে আসবে সাঁই সাঁই। হরিণেরা দেখা দেবে। আর পিছু-পিছু আসবে বন-কুকুরের দল, আর শেয়াল আর হায়েনা। রাতের আঁধারে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠবে হাজারটা রাত-চরা মরকত চোখে, তখন আবার ফিরে আসবে শ্লথ ভাল্লুক।

বুনো কথা

পুবের আকাশ সবেমাত্র একটুখানি গলা রুপোর আভা মেখে চিকচিকিয়ে উঠেছে। ধাপে ধাপে পাহাড় উঠে উঠে রাত-জাগা ধূসর আকাশের মহাশূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যেন, তারপরে পাখা মেলে দিয়েছে পাহাড়েরা। দিগন্তে, দিগন্ত ছাড়িয়ে আর ছাড়িয়ে, ছোট হতে হতে নিঃসীমে মিলিয়ে গেছে তারা।

রাত-প্রভাতীর আলো-আঁধারিতে আলোড়ন তুলে সারিবন্দি উড়ে চলেছে পথ-পাগল রাঙামুড়ি হাঁসের দল—দক্ষিণে, আরও দক্ষিণে। পাহাড়ের বরফান মুলুকে লেগেছে শিহরণ, সুয্যিঠাকুর এবার চলেছেন উত্তরায়ণে। ঝুমঝুমে ঝরনার স্বচ্ছ তরলতা তাই কেঁপে-কেঁপে শুভ্র কঠিনতার রূপ নিতে বসেছে। আজও ফার আর দেওদার গাছের দল আকাশে ঝিলিমিলি আঙুল মেলে দিয়ে সোনা-গুঁড়ো আবির-মাখা সুয্যিঠাকুরকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। আর দু-দিন পরে তারা মাথা থেকে পা অবধি শ্বেত তুষারের ছাই মেখে সন্ন্যাসীর মত তপস্যায় নিথর হয়ে যাবে। এই সময় তাই সবুজ বনানী পাহাড়ের মাথা থেকে মেঘলায় নেমে আসে। আর সেইসঙ্গে নামে জানোয়ারের দল।

বন-তিতিরের প্রভাতী ডাক শোনা যায় এই নিচের বনে—'ওঠো ওঠো, জাগো! কত ঘুমোচ্ছ? দেখ না সুয্যিঠাকুরের রথ দেখা দিল? তার সাতরঙা ঘোড়ার খুরে আকাশে উড়বে এবার রঙিন ধুলো!'

বন-তিতিরের বোকা বৌগুলো ডানা ঝাপটে নিজেদের মনে বকে যায়, 'কুঁ কুঁ, কুম্ কুম্ !—ছেলেগুলোকে খাওয়াতে হবে। তারপরে ঝরনার জলে চানও আছে—একটু রোদে পিঠ দিয়ে বসে পাখনাগুলো ঠুকরে নেওয়া আছে। কত কাজ !'

ঝিলিমিলি তিলক-কাটা রঙিন পালক মেলে বন-তিতিরগুলো নেমে আসে মাটিতে। লাল চোখ, আর লাল টুকটুকে পা তাদের, হিমালয়ের পাহাড়ি এরা। ফাঁকে ফাঁকে ঝোপে ঝাড়ে পোকা আর মাকড়েরাও বাইরে বেরিয়ে এল। সুয্যিঠাকুরের পুজো তো হয়েছে, এবার পেট-পুজোর জোগাড় করা যাক।

পাহাড়ের মাথা থেকে বরফের ঢল হামাগুড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসতে থাকে শিবের জটার মত। ওপরের সে শীত আর সহ্য হয় না ওপরের জানোয়ারদের। বরফের আগে-আগে নামতে থাকে তারা। এইরকম একটা তুষার মুলুকের খেঁকশেয়ালের পরিবার নেমে আসছে এই বনে। ঝুপড়ি শাদা লোমে ঢাকা, মা আর তুলতুলে ছটফটে তিনটে ছোট বাচ্চা। খেঁকশেয়ালদের পায়ে চলার আওয়াজ হয় না, কিন্তু বাচ্চাগুলো ছটফটিয়ে ছটকে যাচ্ছিল। শেয়াল-মা পেছন ফিরে মৃদু কেমন একটা শব্দ করে উঠল, আর একসার হয়ে গেল বাচ্চার দল। লম্বা লম্বা ঘাস আর পাতা আর পাথরে পাহাড়ি বন ছেয়ে আছে। পাথরে জড়িয়ে আছে কতদিনের সবুজ শ্যামল শ্যাওলা। তার ওপর দিয়ে তাকাও—সোনার মুকুট-পরা শুভ্র শ্বেত বরফান মুলুক তোমার চোখ ধাঁধিয়ে দেবে। শাদা সেই বরফের পটে গা মিশিয়ে মিশিয়ে নেমে আসছিল খেঁকশেয়ালের দল। রাঙামুড়ি হাঁসেরা আকাশ নিয়েছে। দু-দিন শেয়ালদের খাওয়া হয়নি। নিচের সোনালু গাছের বনে বন-তিতিরের ডাক শেয়াল মায়ের

কানে যায়। নিথর নিস্তব্ধ বনানীতে তিতিরের ডাক কেঁপে কেঁপে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। শেয়াল-মায়ের চোখদুটো কেমন যেন চকচকে হয়ে ওঠে আশায় আনন্দে।

প্রায় শোনা যায় না এই রকম একটা শব্দে বন-তিতির চমকে তাকিয়ে একটা সাবধানী ডাক ডেকে উঠল। শেয়াল-মা বনের মধ্যে নিথর দাঁড়িয়ে গেল। বন-তিতিরটা কি টের পেয়েছে? কী জানি! কিন্তু বন-তিতিরটার বোকা বৌগুলো পরম নিশ্চিন্ত। কর্তাগুলো ঐরকম শুধু ভয় দেখাতেই আছে! শেয়াল-মা গোঁফ চুমরে বন-তিতিরের একটা বৌকে তাগ করতে যাবে, এমন সময়—পেছনে কী একটা শব্দ? কেউ আসছে? শেয়াল-মা সজাগ কানটা আরও খাড়া করে দিল। নাঃ, শব্দটা আর নেই। কিন্তু না, বোধহয় হাওয়ার শব্দই হবে। শেয়াল মা নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ল বন-তিতিরের একটা বোকা বৌয়ের ঘাড়ে।

একটা কর্কশ কাঁপানো আওয়াজে বন ভরে উঠল এক মুহূর্তে।

বন-তিতিরগুলো উড়ে গেছে পাখা ঝটপট করে। শেয়ালের আজ পরম ভোজ—মারা পড়েছে একটা।

এদিকে কিন্তু শেয়ালেরা যখন নামছিল বরফের মুলুকে, পাহাড়ি নেকড়ে একটা পিছু নিয়েছিল শেয়ালদের। এ অঞ্চলে আর জানোয়ার নেই। নেকড়ে বাঘটা তাই ক-দিন উপোস করে ছিল। পথে মিটমিটে চোখ দিয়ে দূর থেকে সে দেখছিল শেয়ালেরা নামছে। শেয়ালেরা প্রায় নেকড়েদের জ্ঞাতিভাই। ক্ষিদের সময় আর বিচার করা চলে না।

এদিকে শেয়ালেরা যখন পেট পুরে বন-তিতিরটাকে হজম

করে একটা আশ্রয়ের খোঁজে এগিয়ে চলেছে, নেকড়েও চলেছে তাদের পেছনে পেছনে।

সোনালু গাছের দল ছাড়িয়ে খানিকটা একটু ফাঁকা আকাশ। সূর্যের আভা আকাশের উজ্জ্বল নীল মেঘে সোনালু গাছের বড়-বড় সোনালি ফুলে লেগে ঠিকরে যাচ্ছে—এমন সময়, হঠাৎ বলা-কওয়া নেই, আকাশে ধেয়ে এল কালো মোষের মত শিঙ নেড়ে নেড়ে দুজোড়া পেট-মোটা কালো মেঘ। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামল। শেয়ালেরা বনের আড়াল ছেড়ে ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে যাবে, এমন সময় নেকড়েটা ঝাঁপিয়ে পড়ল শেয়াল-মার ঘাড়ে।

শেষ মুহূর্তেও শেয়াল-মা কি যেন একটা হেঁকে বলল বাচ্চাদের। বাচ্চা-তিনটেও ছোট-ছোট পায়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগল সামনের পাহাড়-গুহাটার দিকে। মা তাদের তখন নেই।

নেকড়েগুলো বড় লোভী। মা-টাকে শিকার করেই ক্ষিধে তার মিটতে পারত আপাতত; কিন্তু চোখের সামনে দিয়ে তিনটে কচি-কচি শিকার পার হয়ে যাবে? খেঁকশেয়ালিকে সাবাড় করে নেকড়েটা একটা বাচ্চার পিছু নিল। বাচ্চাটা তখন গুহার মুখোমুখি এসে পড়েছে, কিন্তু লাফের পর লাফে এগিয়ে আসছে সাক্ষাৎ মরণ। শিকারও বাগে এসে গেছে। নেকড়েটা দেশি ভাষায় খল্-খল্ করে হেসে উঠল। অবশ্য খিচোনো সেই হাসিতে। বন রি-রি করে উঠল।

মুখের হাসি কিন্তু মুখেই রয়ে গেল। সভয়ে নেকড়েটা দেখল, প্রকাণ্ড যমের মত দু-পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে বুক চাপড়াচ্ছে একটা কালো ভাল্লুক। কুতকুতে চোখদুটো তার ভাঁটার মত জ্বলছে। দাঁতগুলো বেরিয়ে হিংস্র হয়ে উঠেছে।

ভাল্লুক-মা তার ছানাপোনা নিয়ে পাহাড়ের সেই গুহাটায় থাকত। নেকড়েকে হিংস্রভাবে তার গুহার দিকে ছুটে আসতে দেখে ভাল্লুক-মা ভেবেছিল, নেকড়েটা বুঝি তার ছেলেগুলোকেই শিকার করতে আসছে!

তখন আর ফেরার সময় নেই। নেকড়েটা লাফ দিয়েছে, আর ভাল্লুক-মা তাকে বুকে লুফে নিল। তীক্ষ্ণ নখ আর সবল থাবায় মুহূর্তে ফালা ফালা হয়ে গেল নেকড়েটার দেহ।

বৃষ্টি ধরে গেছে। নাচ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ঘুঙুর-খোলার মত টুং টাং করে আওয়াজ হচ্ছে গাছের পাতায় আর থেমে-যাওয়া বৃষ্টির জলে! শকুনেরা নেমে মরা জানোয়ারগুলো শেষ করে ওপর-ওপর পরিষ্কার করে দিল বন। তারপরে দেখা গেল পিঁপড়ের সার। যেটুকু রক্ত-মাংস পড়ে আছে, তাও চেঁচে পুঁছে সাফ করে দেবে তারা। কিন্তু সেখানেও দেখা গেল চলেছে সেই বেঁচে থাকার যুদ্ধ।

পিঁপড়েরা বেশ নিয়ম-মানা প্রাণী। তারা চলেছে সার বেঁধে, শুঁড়ে শুঁড়ে সবে কথাবার্তা বলে নিচ্ছে। এমন সময় কোথা থেকে ছোট একটা মাকড়সা টুপ করে একটা পিঁপড়ের সারের ওপর লাফিয়ে পড়ে দুটো পিঁপড়েকে মুখে করে দে-ছুট! এদের বলে নেকড়ে মাকড়সা। পিঁপড়ে আর মাছি শিকার করে খায় এরা।

পিঁপড়েদের দলে মহা হৈ চৈ! কিন্তু শত্রু তো হাওয়া! বাধ্য হয়ে পিঁপড়েরা আবার সার বাঁধে। আবার হঠাৎ নেকড়ে মাকড়সার আক্রমণ। পিঁপড়েরা ছত্রছান হয়ে যাবার জোগাড়! এমন সময় কোথা থেকে উড়তে উড়তে এল এক কুমরেপোকা।

শীত আসছে, কুমরেপোকা মাটির বন্ধ, দেওয়াল-তোলা ঘর করে ডিম পাড়বে। বাচ্চাদের খাবার চাই।

নেকড়ে মাকড়সাটা পড়বি-তো-পড় একেবারে কুমরে-পোকাটার সামনে। নেকড়ে মাকড়সাদের সাক্ষাৎ যম হল কুমরেপোকা। টুপ করে কুমরেপোকাটা লাফিয়ে পড়ল মাকড়সার ঘাড়ে। একটি হুল! অসাড় হয়ে গেল মাকড়সা, আর তাকে টানতে টানতে বাসায় নিয়ে চলল কুমরেপোকা। সারা শীতকাল ধরে তার বাচ্চারা ডিম ফুটে খাবে।

এ জগতে যেন ভাঙাগড়ারও অন্ত নেই। কোন প্রাণীই বলতে পারেনা আমিই সব শেষ—আমার ওপর আর নেই কেউ। প্রাণীর সেরা মানুষও নয়। উদার অনন্ত আকাশের পানে চেয়ে, রহস্যময় এই বন জগতের প্রাণীদের ভাঙা গড়ার ঢেউয়ের তালে মনে হয়না কি—কে চালাচ্ছে এই অনাদি কালের সৃষ্টি আর প্রলয়? কে যে হাসায় আর কে যে কাঁদায়?

শীত চলে গেছে। বসন্তের ফুলে ফুলে সোনালু বন জৌলুস মেখেছে। চলেছে হিমালয়ের গায়ে রডোড্রেনড্রন ফুলের ফাগুয়ার ফাগ খেলা। মৌ-টুসকি পাখির দল ফুলের মুখে জোর পাখার চামর তুলিয়ে মধু আহরণ করছে। রাঙামুড়ির দল ফিরে চলেছে। শাদা বরফে বরফে গা মিলিয়ে খেঁকশেয়ালির দল ওপরে উঠেছে আবার।

বন-তিতিরের আবাহনে থেকে থেকে স্তব্ধ বন মুখরিত হয়ে উঠছে। কাকে আবাহন? দেওদার আর ফারও একটা মাথা তুলে দিয়েছে আকাশে। কাকে যেন একবারটি উঁকি মেরে দেখে নেবে।

———

পাহাড়ি

এই কালো কালো পাহাড়ি কেল্লায় আকাশ যেন দিক্‌বিদিক হারিয়ে ফেলেছে। আলো নিয়ে পথ দেখাতে এসে চাঁদের ফালিটা আকাশে হিম হয়ে জমে গেছে। মুখের হাসিটা মিলিয়ে যায় নি বটে, কিন্তু সে হাসি বড় ম্লান, করুণ, হলুদ বরন। কালো উষ্ণীষ-তোলা ফার গাছগুলো নিঃশব্দ প্রহরীর মত নিথর। দীর্ঘ দেওদার গাছগুলোর মাথায় অনেক উঁচুতে যাযাবর বুনো হাঁসের দলের ডাক ভেসে এল—হঁক—হঁক, হঁক—হঁক! বাতাসে শীতের তুষার-নিশ্বাস।

রাত-শেষের আলো-আঁধারিতে এই পাহাড়ি বুনো বিলের শিরশিরে ঠাণ্ডা জল ভেঙে উঠে কাদাখোঁচারা যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল। এখনও কি ওঠেনি সেই মহা হিমালয়ের আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ে ধাক্কা-খাওয়া উত্তুরে বাতাস? সেই হিমেল হাওয়া—যা টেনে নিয়ে যায় মনকে, কোথায় কতদূরে, ঘরছাড়া করে ভারতের সমতলের দিকে? পেছনে পড়ে থাকে তাকলা মাকান, মানস সরোবর, নেলাং, আর গুরিংলা গিরিপথ। কিন্তু সর্দার এখনও হুকুম দেয়নি।

ঘুম ভেঙে দলে দলে বিলের ওপর ভেসে আসতে আসতে ছোকরা কাদাখোঁচার দল খাওয়া ছেড়ে জলের ওপর ডানা ঝাপটাতে থাকে। সকলেরই মন উড়ু-উড়ু। সর্দার আর দলের অভিজ্ঞ পাখিগুলো কী! এই তো আর-একটা সকাল

রুপোর মত ঝকঝকে। বাতাসে হিম তুষারের আমেজ। এখনও সর্দারের ঘুমই ভাঙল না! এমন সময় দলে-দলে আরও সব কাদাখোঁচারা শরবনের ভেতর থেকে বিলের কোলের ঝোপ-ঝাড় থেকে বেরিয়ে শিরশিরে জলের ওপর দিয়ে ভেসে আসতে আসতে কেউ মাথা ডুবিয়ে যেতে লাগল কেউ ডানা ঝাপটে স্নান সেরে নিল। ছোকরাদের মত ব্যস্ত হবার কী আছে?

কাদাখোঁচাদের মাথার দু-পাশ শাদা, গলা আর পিঠ খয়েরি। পা দু-খানা সবুজ, আর ঠোঁট বেশ লম্বা। বিলের ভেতর মুখ ডুবিয়ে এরা পোকামাকড় সন্ধান করে খায়। দূর থেকে সবুজ গাছের ছায়া-মাখা জলে, কাঁপা-কাঁপা কালো পাহাড়ের মাথার তুষার-চূড়ায় ছায়া-ধরা জলের মাঝখানে দলকে দল খয়েরি রঙের কাদাখোঁচাদের দেখলে মনে হয়, যেন জলে কে গেরুয়া রঙ ঢেলে দিয়েছে।

ছোকরা কাদাখোঁচারা দল পাকিয়ে এসে সর্দারদের জিজ্ঞেস করল, 'আর দেরি কেন? আজ তো গেলেই হয়!'

সর্দাররা বলল, 'কেন? তুষার-শেয়াল দেখা গেছে কি?'

'কই?' ছোকরারা চমকে বলল।

'তবে এখনও সময় হয় নি। ওপর-পাহাড়ে যখন তুষার নদী ধীরে ধীরে নামতে নামতে কঠিন বরফ হয়ে জমে যাবে, ফার আর দেবদারুর মাথা যখন বুড়োমানুষদের মত শাদা হয়ে উঠবে, তুষারের ছোঁয়ায় তখন নামবে ওপর-পাহাড় থেকে লাল শেয়াল বন-তিতিরদের পিছু পিছু। তখন হল যাত্রী-পাখিদের যাওয়ার সময়। কাদাখোঁচারাও তখন মেলে দেবে পাখা।'

'কিন্তু'—ছোকরা পাখিরা বলল, 'কাল রাতে কড় হাঁসেদের হঁক-হঁক যাওয়ার ডাক শোনা গেছে আকাশে। তারা কি বোকা?'

'কড় হাঁসেদের জিজ্ঞাসা কর।'—সর্দার কাদাখোঁচারা একটু মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বলে, 'ওই দেখ—দূরে ভাসছে তারা।'

অভ্রভেদী রুপোলি বরফান মুকুট পরা পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে সূর্য উঠে রুপোলি মুকুটের ওপর সোনা ঢেলে দেয়। পাহাড়ি বনের ভেতর বন-তিতিরের চড়া ডাক ভেসে আসে। কাদাখোঁচা-দের একটা ছোট দল জলা থেকে উড়ে যায় বন-তিতিরদের কাছে লাল শেয়ালের খোঁজ নিতে। দুটো কিয়াং গম্ভীর গতিতে বিলে জল খেতে আসে।

কিয়াংরা একরকম বুনো গাধা—পাহাড়ি হাওয়ার মত স্বাধীন।

কাদাখোঁচাদের সর্দাররা জিজ্ঞেস করল, 'ও ভাই কিয়াং, লাল শেয়াল-টেয়াল নেমেছে জান?'

'হুঁ!' কিয়াংরা বলল, 'লাল শেয়ালদের আবার কী ভয়? তুষার-নেকড়েগুলো কিন্তু ভারি শয়তান!'

'নেকড়েদের ভয় থাকলে মানুষের ঘরে গিয়ে থাকলেই পার!'

কিয়াংরা বলল, 'আমরা কি য়্যাক? মানুষদের মোট বয়ে মরব—বাচ্চাদের দুধ না দিয়ে মানুষদের দুধ দেব? কিয়াংদের বাঁধা আর পাহাড়ি হাওয়া বাঁধা একই কথা। কিয়াংরা য়্যাক নয়।'

য়্যাক একরকম পাহাড়ি চমরী গরু, পোষ-মানা—অথচ সবল, দুর্দান্ত।

ছোকরা কাদাখোঁচারা কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। তারা দল বেঁধে কড় হাঁসেদের কাছে গিয়ে হাজির। কড় হাঁসেরা এক হাত দেড় হাত লম্বা পাখি। তাদের পিঠ, ঘাড় আর

মাথার পালকের রঙ কতকটা খয়েরি। বুক আর পেটের রঙ ধূসর। এই মেলানো-মেশানো খয়েরি ধূসরের মধ্যে ঠোঁট আর পায়ের রঙ হলদে। কড় হাঁসেরা তখন দল বেঁধে কুচকাওয়াজ করছিল। একটা দল ঠিক একেবারে এক সারে ভেসে চলেছে, বাঁক নিচ্ছে ঠিক সার বজায় রেখে, আবার ঘুরে আসছে। ঠিক যেন একটা ময়ূরপঙ্খী নৌকোর সার ভেসে চলেছে। কোন সারের মাথায় বা তিনটে করে কড় হাঁস, আবার কোথাও বা গোল হয়ে একটা হাঁসের দল যেন মস্ত বড় একটা পদ্মফুল ভেসে আছে।

ছোকরা কাদাখোঁচারা শুধোলে, 'হ্যাঁ ভাই কড় হাঁস, তোমরা বুঝি যাওয়ার কুচকাওয়াজ করছ?'

কড় হাঁসেরা বলল, 'কড় হাঁসেরা এলোমেলো ওড়া পাখি নয়। কুচকাওয়াজ না করলে পাহাড়ি হাওয়ায় শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে!'

ছোকরারা অস্থির,—'তা যাবে না তোমরা?'

'লাল শেয়াল নেমেছে কি?'—একজন কড় হাঁস জিজ্ঞেস করল।

'নেকড়ে বাঘ কি কিয়াংদের পেছনে ছুটছে?'—আর-একজন।

'শ্লথ ভাল্লুক কি ঘুমোতে ঢুকেছে গুহায়?' আরও একজন।

'ওদের সঙ্গে কড় হাঁসেদের আর কাদাখোঁচাদের কী দরকার?' জিজ্ঞেস করল কাদাখোঁচারা।

'তবেই তো বুঝতে হবে আসছে উত্তর-মেরু বয়ে, সাইবেরিয়ার ওপর দিয়ে তুষার-কম্বল-মুড়ি-দেওয়া উত্তুরে ঝড়। তারই আগে পাখিদের যাবার সময়।'

'কাল রাতে য়্যাকদের বাঁকানো শিঙের মত চাঁদ যখন পশ্চিম পাহাড়ের মাথা ছোঁয়-ছোঁয় তখন যে আমরা শুনলাম কড় হাঁসেরা ডাকছে আকাশে ?'

কড় হাঁসেরা হেসে বলল, 'কড় হাঁস নয়, ওরা কড় হাঁসেদের পশ্চিমে জ্ঞাতি ভাই—রাঙামুড়ি, শরাল, আরও কত কী। আসে সাইবেরিয়া থেকে, সুইডেন থেকে, নরওয়ের ফিয়োর্ড ছেড়ে। বহু দূরের যাত্রী ওরা। সাহেবি বুলি ওদের, সব বোঝা না গেলেও ভারতের সমতল জলায় সমান হয়ে একেবারে মেশে হাঁসেরা।'

বন-তিতিরেরা বনের নিরীহ পাখি। গোলগাল টেপাটোপা চেহারা। পিঠের ওপরটা লালচে পাঁশুটের ওপর শাদা-শাদা ফুটকি, গলার তলাটি কালো, আর গলা থেকে ডানার নিচে পর্যন্ত হলদে পাঁশুটের ওপর কালো কালো ডোরা। এদের নাম গুলু-তিতির। হিমালয়ের বনে আট-ন হাজার ফুট উঁচুতে পর্যন্ত এরা থাকে। গুলু-তিতিরদের গিন্নিরাই বাড়ির মালিক। কর্তামশাই খান দান আর গাছের ডালে উড়ে গিয়ে গান গান। ভোরের আলোয় পাহাড়ি বরফান চূড়া যখন সোনা-রঙ মেখে ঝলমল করে ওঠে, গুলু-কর্তার আনন্দ-মাখা স্বর বেজে ওঠে বনে-বনে। গিন্নি ধমক দেয়,—'ডর্-র্ ড-র্! ওরে, শেয়াল আসবে!'

কিন্তু পাহাড়ি ঝকঝকে আকাশ যখন সুনীল হয়ে হেসে উঠেছে, ঠাণ্ডা বাতাস যেন একতারার চমকানো ঝঙ্কার, তখন কি আর শেয়ালের কথা মনে থাকে ? বাসার মাথার ঘাসের ডগার চাঁদোয়া সরিয়ে গুলু-গিন্নি উড়ে আসে কর্তার পাশে, আর গুলু-তিতিরদের ডাক এ বন থেকে ও বনে ছড়িয়ে যায়। গুলু-

তিতিরদের বাসা মাটিতে ঘাসের গর্তে, যেখানে লম্বা লম্বা ঘাসের ডগা বাসার মাথায় ঝুঁকে পড়ে ঢেকে রাখে, আকাশে মাথা তুলে সরল দেবদারু গাছেরা শির-শির করে কাঁপে, ফার গাছেরা আকাশে হাতছানি দিয়ে চেয়ে থাকে। ভাল্লুক-দাদা বন-তিতিরদের ডাকে আড়ামোড়া ভেঙে উঠে পড়ে। আবার একটা ঝকঝকে সকাল। ফলটা মূলটা, উইঢিপি কোথায় আছে? মৌমাছিদের চাকে মধু কি শেষ? কিয়াংরাও একবার পাহাড়ি চড়াইয়ে দাঁড়িয়ে থমকে শোনে গুলু-তিতিরদের প্রভাতি আবাহন। নিচে খাদ নেমে গেছে কোথায়—কোন্ অতলে। সাপের খোলসের মত নিচে কোথায় একটা পাহাড়ি নদী যেন চিক্‌চিক্ করছে, আর সামনে নিঃসীম নীল আকাশ। হাওয়ার মত স্বাধীন একটা দিন তার ঐশ্বর্য নিয়ে ফুটে উঠেছে।

'কঁ-ক, ড-র্'—ডেকে উঠে গুলু-কর্তা ঘাসের বাসার ভেতর থেকে সভয়ে লাফিয়ে উঠল।

'পালা পালা, শেয়াল—লাল শেয়াল!' চেঁচিয়ে উঠল গুলু-গিন্নি তখন উড়ে গিয়ে গাছের ডালে। আর দেখা গেল, লালচে মোটা সিল্কের মত লোমে ভরা একটা লাল শেয়াল তাড়া করেছে গুলু-তিতিরটাকে। লাল শেয়ালের মোটা লেজের ডগাটি তুষারের মত শাদা, চমকাচ্ছে।

গুলু-গিন্নি চেঁচিয়ে ডেকে ওঠে, 'ওরে বোকা, উড়ে যা না গাছের ডালে!'

কিন্তু গুলু-তিতিরটা তখন গুলিয়ে ফেলেছে মাথা। ঝটপট করে সে খানিকটা উড়ে যাচ্ছে, আবার মাটিতে লাফিয়ে পড়ছে।

আর শেয়ালটা ঘাসের ভেতর দিয়ে, গাছের ফাঁক দিয়ে নিঃশব্দে কখন লাফিয়ে পড়েছে গুলু-তিতিরের ঘাড়ে।

দুঃখ হয়েছিল বৈকি গুলু-গিন্নির। কর্তাকে যখন লাল শেয়াল মুখে করে নিয়ে চলে গেল, গুলু-গিন্নি তখন রাগে আর দুঃখে ডর্‌র্‌ ডর্‌র্‌ করে অনেকক্ষণ ধরে বলল, 'কী বোকা! কী বোকা!'

লাল শেয়াল এ বাসার সন্ধান পেয়ে গেছে। আর-একটা খুঁজতে হবে তাকে। আবার একটা কর্তাও জোগাড় করা চাই। বেশিক্ষণ দুঃখ করার অবসর কোথায়?

পাহাড়ি সন্ধ্যা অপরূপ রঙ ফলিয়ে দেয় পশ্চিম আকাশে। সে দিকটা পাহাড় আর পাথর, গাছপালা নেই। পাহাড়ি গুহার মুখে পাথর জড়ো করে দিয়ে ভাল্লুক-দাদা গুহার ভেতর ঝিমোচ্ছিল। পেটটি সে যতদূর সম্ভব ভরে নিয়েছে। এইবার ঘুমের সাধনা। সারা শীতটা সে এই গুহায় ঘুমিয়ে কাটাবে। তুষার আর বরফে ছেয়ে যাবে চারদিক। ভাল্লুক-দাদার কিছু এসে যাবে না। তারপর যেদিন বরফ গলে মাটি থেকে আবার দেখা দেবে সবুজ অঙ্কুর, রডোড্রেনড্রন গাছে ফুটে উঠবে থোকা থোকা ফুল, মৌমাছিরা ছুটে আসবে গন্ধ-বাতাসে, ভাল্লুক-দাদার ঘুম ভাঙবে ক্ষিধে নিয়ে।

হঠাৎ দৌড়ের শব্দে আর হো হো হাসির আওয়াজে ভাল্লুক-দাদার ঝিমুনি ভেঙে গেল। ঘুমের ব্যাঘাত হলে ভাল্লুক-দাদা মহা রগচটা লোক। হুড়মুড় করে গুহা থেকে বেরিয়ে এসে ভাল্লুক-দাদা দেখে, কিয়াংদের তাড়া করেছে তুষার-নেকড়ে। কিয়াংরা ভাল্লুক-দাদাকে ঘাঁটায় না, আর নেকড়ে পাজিটা কিনা

এসেছে ঘুম ভাঙাতে! ভাল্লুক-দাদা দু-পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে নেকড়ের পথ জুড়ে বলল, 'গর্‌র্‌! গোঁ! গর্‌র্‌!'

নেকড়েটা থমকে দাঁড়িয়ে দাঁতগুলো খিঁচিয়ে বলল, 'হো হো হুড্ডা! হুর্‌র্‌!'

ভাল্লুক-দাদা এক লাফে এগিয়ে গিয়ে চালাল এক থাবড়া। নেকড়েটা ক্ষিপ্র পায়ে পেছিয়ে গেল, 'হো হো, হুড্ডা হুড্ডা—র্‌ র্‌ র্‌!'

ভাল্লুক-দাদার আর-এক লাফ, আর বাতাসে থাবড়াটা তার ঘুরে গেল। কিয়াংরা পালিয়েছে। নেকড়ে হাওয়া। ভাল্লুকদের কে ঘাঁটায়!

ভাল্লুক-দাদা গর্‌-গর্‌ করতে করতে এসে গুহায় ঢুকে থাবার ভেতর মুখ গুঁজে আবার ঝিমোতে শুরু করল।

কুচকাওয়াজ! কুচকাওয়াজ!

কড় হাঁসেরা তেকোনা সার বেঁধে বেঁধে আকাশে উঠছে। দলের পর দল। যাত্রার হুকুম বেজে বেজে উঠছে আকাশে—হঁক, হঁক! আর দলের পর দল তেকোনা লাইনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আকাশে—পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে, য়্যাকের বাঁকানো শিঙের মত বাঁকা চাঁদের কোল ঘেঁষে, ভেদ করে ধোঁয়াটে মেঘরাজার সৈন্যসামন্ত। প্রচণ্ড বেগ তাদের পাখায়।

আর কাদাখোঁচারাও পরদিন ভোরে আকাশ ছেয়ে আকাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গিরিবর্ত্মের ফাঁকে ফাঁকে, দেবদারু ফারের মাথায় মাথায় উড়ে চলে তারা। কোথায় কোন্ সুদূর সমতল জলা তাদের ডাক দিয়েছে। পাখা তাই চঞ্চল, যাযাবর। হয়তো পথে বাজপাখি ঝাঁপিয়ে পড়বে দলে, হয়তো শিকরেরা

নেবে ক-জনকে, হয়তো বন্দুকের মুখে টুপটাপ ঝরে পড়বে কেউ শীতের গাছের পাতার মত। আর পেছনে ফার গাছের ডাল তুষার মেখে সব-ছাড়া ছাইমাখা সন্ন্যাসীর মত শাদা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দেবদারুর মাথা তুষার-ভারে নুয়ে আসে। বরফান পাহাড় আলোয় আঁধারে ধাঁধিয়ে ওঠে।

পাথরে তুষারে গুহামুখ ঢাকা। ভাল্লুক-দাদা ঘুমোয়।

কেউটে

একটুখানি নীল খোলা আকাশ, একটুখানি রোদ-মাখা খোলা মাটি—ভগবানের সৃষ্টি কত প্রাণীকেই টানে! শহরতলির ছোট বাগান, একদিন রোদ-জল মেখে ন্যাংটা খোকার মত আকাশের নিচে মাঠ হয়ে পড়ে ছিল। মাঠের একদিকটা ঘেরা হল একদিন, ভেতরে উঠল ছোট্ট একটা বাড়ি। তারপরে এল গাছেরা। জুঁই, চাঁপা, টগর, শিউলি, বেল। ফুলের মিষ্টি গন্ধ নিয়ে এল মৌমাছি, প্রজাপতি আর মৌ-টুসকি পাখিদের। মৌমাছিরা বাঁধল বাসা, প্রজাপতি এঁকে দিল রামধনু, আর ছোট্ট মৌ-টুসকি পাখিদের পাখায়-পাখায় ফুলেরা যেন গান গেয়ে উঠল।

আর এল কত পাখি—শ্যামা, দোয়েল, শালিক। কোকিলেরা বসন্তে কূ-উ কূ-উ করে বাগানকে উদাস করে দিয়ে গেল, আর ছাতারে পাখির দল বুক ফুলিয়ে এঁকে-বেঁকে বাগানে বলে বেড়াতে লাগল—টক্-টক্-কট্-র্-র্-টক্! মানে কী বুঝে দ্যাখো।

এদের তো সব দেখা যায়। অল্প দেখা, অদেখা আর না-দেখারাও এল সবাই। বাগান পড়েছে, ফুলের মধু আর ফলের শাঁস আর শাঁসের বীজ কি ভোলা যায়? এল ইঁদুরেরা, এল ব্যাঙ, কাঠবেড়ালিরাও এল, এল বেজি, আর সবশেষে এল কালো কেউটে সাপ একজোড়া।

ইঁদুরদের রাত বিরেতে দেখা যায়, রান্নাঘরের পানে চলেছে

নিঃসাড়ে। বেজিদের মোটা কাশফুলের মত ল্যাজগুলো কাচিৎ ঘাসের ভেতর দোলে। সাপেরা সাবধানি জানোয়ার, মানুষকে এড়িয়ে চলে, দেখাই যায় না তাদের।

কোন-কোন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর, শুকনো মাটি যখন জিভ-বার-করা কুকুরের মত হা হা করতে থাকে, আর আকাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে কালো মেঘের দল যখন শিং নেড়ে নেড়ে তেড়ে আসে, প্রথম সেই বর্ষার আগমনে অবাক খুশিতে ভরে ওঠে পশু-পাখির মন। ব্যাঙেরা আর খুশি চাপতে পারে না। মনের আনন্দে গলা ছেড়ে গেয়ে ওঠে তারা—গ্যাঙ গ্যাঙ, গ্যাঙোর গ্যাঙ! আর সাপেরাও খুশিতে সড়াক করে পিছলে বেরিয়ে পড়ে। ব্যাঙ ফলার আজ তাদের বাঁধা।

* * *

কেউটে সাপ আমরা জানি ভীষণ হিংস্র জানোয়ার। কিন্তু সাপ বেচারিরা জানে তারা নিতান্তই ভালোমানুষ। মানুষের ছায়া দেখলেই নিঃশব্দে তারা সরে পড়ে। বেজিরাও জাত-শত্রু। কেউটেরা এড়িয়ে চলে বেজিদের। আর বেজিরাও জানে সাপেদের খবর। কিন্তু প্রাণী-জগতের নিয়ম—সবাই থাক, খাও, কিন্তু ঘাঁটিওনা কাউকে।

* * *

শীত আসে। কোকিলেরা উড়ে যায় দক্ষিণে। শিউলি ঝরে ঝরে বিছিয়ে থাকে বাগান। সাপেরা গর্তে ঢোকে। সারা শীত তারা ঘুমোবে। পাতা-ঝরা বাগানে এদিক-ওদিক দাপাদাপি করে বেড়ায় কাঠবেড়ালি। শীতের সময় না ছুটলে কি রক্ত গরম হয়? কাঠবেড়ালিদের শীতের ভাবনা নেই। তারা সঞ্চয়ী প্রাণী। সারা বছর ধরে গাছের কুঠুরিতে কুঠুরিতে

খাবার জমিয়েছে তারা। সারা শীতটাই তাদের এখন খেলার সময়।

আর শীতেই ইঁদুরগুলোর দৌরাত্ম্য বেড়ে ওঠে। ইঁদুরেরা একটু বেহিসেবি লোক। ছানা-পোনা তাদের একটু বেশি হয়। একে দল বেড়ে চলে, তায় শীতে বাগানে খাবারের অভাব, তাই দু-পেয়েদের রান্নাঘরের দিকেই আনাগোনাটা তাদের বেড়ে চলে। এক-আধজন হলে গা-ঢাকা দেওয়া যায়, কিন্তু দলকে দল যখন ভাঁড়ার আক্রমণ করে, তখন যুদ্ধ বাধা ছাড়া উপায় নেই। দু-পেয়েরা কেল্লা গড়তে থাকে।

প্রথমে রান্নাঘর আগলাতে এল এক হুলো বেড়াল। প্রথম-প্রথম ইঁদুরেরা একটু থমকে গিয়েছিল, কিন্তু তারা ভেবে দেখলে, না খেয়ে তো আর থাকা যায় না! তারা কি নেংটি ইঁদুর, যে একটা হুলোর ভয়ে পিছিয়ে যাবে? বড়-বড় গোঁফ নেড়ে, 'ইন্‌কেলাব জিন্দাবাদ' বলে দল বেঁধে তারা এগিয়ে গেল। হুলোর গলায় ঘণ্টা তারা বাঁধবেই।

হুলো আর দাঁড়ায়? ল্যাজ তুলে, জানলা গলে একেবারে বাগানে শিউলি-তলায় ঘাসের ভেতর। ঘাসের ভেতর একটা বেজি-বাচ্চা রোদ পোয়াচ্ছিল। মা তার গেছে খাবারের সন্ধানে। নিতান্ত ছোট্ট বাচ্চা, হুলো-মশাই পড়বি তো পড় একেবারে তার সামনে। ওরে বাবা! হুলো ভাবল, এ ক তৈমুরলঙের আক্রমণ? এগোলে তৈমুর, আর পেছলেও বৈরাম! কিন্তু না, ওটাই যেন ভয় পেয়েছে! আর হুলোর তেজ দ্যাখে কে!

'ফ্যাঁস্ ফোঁ! গর্‌র্! ইয়ে বেটা ডাকু! ইঁদুরকা চাচাতো ভাই!'

হুলোর সেই শিকারি গর্জন শুনে ধেয়ে আসে—লাল শাড়ি আর হাফ প্যান্ট।

'আয় আয় খোকা, হুলো ইঁদুর ধরেছে দেখবি আয় !...ও মা ! এ যে বেজির বাচ্চা !'

খোকা লাফিয়ে ওঠে, 'আমি পুষব, মা !'

'না না, কামড়ে দেবে !'

'না, কামড়াবে না, দ্যাখো !' খোকা বেজির বাচ্চাটাকে আস্তে আস্তে দু-হাতে তুলে নেয়। সে বেচারি কামড়াবে কী ! বাচ্চা মানুষ ; তার ওপর বীর হুলোর ঐ তর্জন-গর্জন ! কেউ যদি তাকে মায়ের মত বুকে তুলে নেয় সে বেঁচে যায়।

* * *

বাগান ছাড়িয়ে মাঠের ওধারে পলাশের বনে আগুন লাগিয়ে একদিন বসন্ত এসে যায়। বাগানও ফুলে ফুলে ঝিমঝিম। রঙ-বেরঙের শুঁয়োপোকা একদিন রেশমি সুতোর জাল বুনে ঘুমিয়ে পড়ে, তারপর ইন্দ্রধনু রঙ মেখে একদিন প্রজাপতি হয়ে উড়ে চলে যায়। সাপেরা গর্ত ছেড়ে আবার বেরিয়ে আসে। ইঁদুরদের তো কথাই নেই—বাচ্চা বেড়েই চলেছে দিন দিন। গাছের মাথায় শালিকেরা ডিমে তা দেয়, গাছের গুঁড়ির ফোকর থেকে কাঠবেড়ালির দুটো বাচ্চা উঁকি মারে। কেউটে সাপও কোটরে ডিম পেড়েছে।

বেজির বাচ্চাটা খোকার পোষ মেনে, খেয়াল খুশিতে বেড়ে উঠতে থাকে। খোকনের পায়ে-পায়ে ঘোরে সে, ঠিক যেন কুকুরের বাচ্চা।

আর বেড়ে চলে রান্নাঘরে ইঁদুরের দৌরাত্ম্য। হুলো ভায়া এখন বেগতিক দেখে ইঁদুরদের ইনকেলাব-এ যোগ দিয়েছে। চোর-পুলিশ মিলে চলে রান্নাঘর লুট !

একদিন কেউটে-গিন্নি বললে, 'দেখেছ, ইঁদুরগুলোর যেন

দাপাদাপি বেড়েছে, একদিন সর্বনাশ ঘটাবে!'

কেউটে বলল, 'ইঁদুর আবার সর্বনাশ কী ঘটাবে?'

'দু-পেয়েরা আসবে একদিন ধেয়ে, সাফ করবে বাগান, আর আমার সোনার বাছারা পড়বে মারা!'

কথাটা কেউটের মনে লাগল। আর সেইদিন থেকে সে ইঁদুর শিকারে লেগে গেল। ধরে আর গেলে। কিন্তু সাপের আহার! একবার গিলে পেটমোটা করে পড়ে থাকে সে, তিনদিন আর খাবার দরকার নেই। কত খাবে সাপ! তবু চেষ্টার ত্রুটি থাকে না। সাপেরা দু-পেয়েদের বুঝিয়ে দিতে চায় যে, কেউটে-সাপেরা তাদের বন্ধু।

এমনি একদিন সন্ধেবেলা একটা গুঁপো ইঁদুরকে তাড়া করে দিক্‌বিদিক ভুলে কেউটে-কর্তা একেবারে এসে পড়ল রান্নাঘরের ভেতরে। লাল শাড়ি উঠল হাঁউমাউ চীৎকার করে। কেউটে সাপ ফোঁস করে ফণা তুলে বলতে গেল, 'চেঁচাচ্ছ কেন? আমি এসেছি ইঁদুর খেতে। দুধের হাঁড়ির গন্ধটা কিন্তু আরও মিষ্টি!'

কেউটের ভাষা যদি দু-পেয়েরা বুঝত! লাল শাড়ির চীৎকার আরও বেড়ে চলে।

মেয়েমানুষগুলোই অমনি!

ফোঁস করে ল্যাজের ওপর ভর দিয়ে ফণা তুলে কেউটে সাপ বলল, 'শুধু-শুধু অমন চেঁচিওনা বলছি! চেঁচালে আমার বড্ড রাগ হয়ে যায়! একটু দুধ খেতে দেবে?'

বেচারি কেউটের পিঠে পড়ল এক প্রকাণ্ড লাঠি। লাল শাড়ির চীৎকার শুনে ধেয়ে এসেছেন দু-পেয়ে কর্তারা। ছুটে এল খোকা আর তার পায়ে-পায়ে বেজির বাচ্চাটা। বেজির চোখ-

দুটো মুহূর্তে জ্বলজ্বলে লাল হয়ে উঠল। কেউটে-সাপ রাগে মাথা ঘোরাতে যাবে, পিঠ ভেঙে গেছে তার। হঠাৎ আচমকা সে দ্যাখে, জাত-শত্রু বেজি সামনে। কেউটে ছোবল মারে বেজির দিকে। বেজি মুহূর্তে লাফিয়ে সরে যায়, আর সাপের মাথায় পড়ে আর-এক লাঠি।

* * *

পরের দিন সাফ হতে থাকে বাগান। ধেয়ে আসে সব কালো কালো পা—শাবল কোদাল আর লাঠি হাতে। ইঁদুরের দলে ছুটোছুটি পড়ে যায়। গাছের মাথায় শালিকেরা নিথর। কাঠবেড়ালি লুকিয়েছে গাছের কোটরে। আর ইঁদুরের গর্ত আর ইঁদুর মারতে মারতে কালো পায়ের দল আবিষ্কার করে সাপের গর্ত—সাপ। গিন্নি ভবিতব্য বুঝে নিয়ে গর্ত ছেড়ে গা-ঢাকা দিয়েছিল। চোখের সামনেই তার ডিমগুলো ছারখার হয়ে গেল। একবারও ফণাটা তখনো তোলেনি সাপ-গিন্নি।

* * *

নিশুতি রাত। খোলা জানলা দিয়ে মিশমিশে কালো আকাশে তারারা হীরের কুচির মত ঝলমল করছে। খোকা ঘুমোচ্ছে একটা নিচু চারপায়ার ওপর। নিঃসাড়ে কেউটে-গিন্নি ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। যে মানুষকে কেউটেরা চিরদিন এড়িয়ে চলেছে, আজ তারই একটাকে সাবাড় না করে তার শান্তি নেই!

খোকা ঘুমোচ্ছিল, নড়ে না। না নড়লে সাপেরা ছোবল দিতে পারে না। চারপায়াটার নিচে সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে বসল, মাথাটা নিচু করে। আর ঘুমের মধ্যে খোকা যেই একটু নড়ে উঠেছে, ফোঁস করে ফণা তুলে লাফিয়ে উঠল কেউটে-গিন্নি।

আর-একটু হলেই ছোবলটা পড়ত, কিন্তু সাপেরও বুক হিম হয়ে গেল ! অন্ধকারের কোণে দুটো জ্বলজ্বলে প্রবালের মত কী জ্বলছে ? সাপ মুহূর্তে ফণা ঘোরালো। আর খোকার পোষা বেজিটা তখন বনের বুনো শিকারি জানোয়ার হয়ে গেছে। চোখ-

দুটো তার জ্বলছে, আর পা টিপে-টিপে লাফানোর ভঙ্গিতে সে এগিয়ে আসছে সাপের দিকে।

খোকা বেঁচে গেল, কিন্তু কাল-কেউটে সাপের হাতে বেজিটা বাঁচবে কি ?

হিস্ করে একটা ছোবল চালাল সাপ, বেজির বাচ্চাটাকে

লক্ষ্য করে। ঝট্ করে পেছিয়ে গেল বেজি, সাপের মাথাটা আবার ওঠবার আগেই সে লাফিয়ে পড়ল সাপের মাথায়। লিকলিকে লম্বা শরীরটা দিয়ে সাপ পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে জড়িয়ে ধরল বেজিটার দেহ, আর বেজিও তার ক্ষুরধার দাঁত দিয়ে ফালা-ফালা করে দিতে লাগল সাপের মাথা। বুকের ওপর সাপের পাকানো চাপ যখন আর সহ্য হয় না, সেই সময় বুকের চাপ আলগা হয়ে গেল। ঢলে পড়ল সাপটা। বেজি একবার আনন্দে ডেকে উঠল—চিকি-চিকি, চিক্-চক্!

খোকা ঘুমোচ্ছে। বাগান থেকে জুঁইয়ের গন্ধ মেখে ঝলকে ঝলকে বাতাস বয়ে এল জানলা দিয়ে।

সেই বনের গল্প

মেঘরাজার বড় রাগ সুয্যিঠাকুরের ওপর। তাই ঈশান কোণে গোঁফ চুমরে হুমকি দিয়ে ওঠে মেঘরাজ। আর দলে দলে ক্ষ্যাপা বুনো মোষের মত ছুটে আসতে থাকে মেঘরাজের সৈন্যদল। পায়ে পায়ে তাদের ধেয়ে আসে ঊনপঞ্চাশ পবন, চোখে চোখে চমকে যায় বিদ্যুৎ, আর আকাশ থেকে বেজে ওঠে মেঘরাজের ডমরু।

সুয্যিঠাকুরের মুখ কালো হয়ে যায় ঈশান কোণে, কিন্তু নৈর্ঋতে আবার দুষ্টু ছেলের মত হেসে ওঠে—টু! আর ঊনপঞ্চাশ পবনে ভর করে মেঘেরা ছুটতে থাকে ঈশান থেকে নৈর্ঋতে, বায়ুকোণ থেকে অগ্নিকোণে। হাওয়ার দাপটে ফুলে ওঠে বনমালা। শাল, শিরিষ, টুন, মহুয়া আর বাওবাব। দোলে হংসলতা, আর হাঁসেরা সার বেঁধে দুলে দুলে জলার জলে ডুব দেয়। নাক-বাঁকা বকফুল মুঠো মুঠো শাদা আবিরের মত কালো মেঘের গায়ে ফেটে ছড়িয়ে পড়ে। আর রুপোলি বকেরা কালাপেড়ে মেঘের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ময়ূরপঙ্খী পাখা চালায় সাঁই সাঁই।

ময়ূর খুলে দেয় তার মরকত মণি পেখম আর মেঘের পানে চেয়ে নেচে ওঠে কেকা নাচ। সে কী নাচ! সৈন্যসামন্ত নিয়ে বনের মাথায় থমকে দাঁড়ায় মেঘরাজ, তারপর গোঁফ চুমরে আকাশ থেকে আকাশে ফেটে যায় অট্টহাসিতে। ক্ষ্যাপা মেঘের দল জল হয়ে যায়। বনের মাথায় ঝুমঝুম ঝুমুর-পরা বর্ষা নেমে আসে নেচে নেচে। ঝুমকো লতা বেয়ে, ঝুমকো

জবার লাল চোখে চিক্‌চিকিয়ে, বট শিরিষের বিশাল বুকে ভর করে বনভূমে।

বৃষ্টি থেমে গেলে সাবধানে শিরিষ গাছের কোটর থেকে মুখ বার করে একটা কাঠবেড়ালি। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বুক জুড়িয়ে যায়। খুর-খুর করে কাঠবেড়ালি কোটর থেকে সবুজ মখমল ঘাসে নেমে আসে। ঝড়বাদলে কত ফলপাকুড়, বীজ পড়েছে—কুড়িয়ে আনতে হবে। আর টুক-টুক করে এ গাছের কোটর থেকে, ও গাছের গুঁড়ি থেকে লোমওয়ালা ল্যাজগুলো উঁচু করে আকাশে চামর তুলিয়ে বেরিয়ে আসে কাঠবেড়ালির দল। কাঠবেড়ালিরা কাজের লোক, সঞ্চয়ী। দু-পায়ে ফলপাকুড়, বীজ গড়িয়ে গড়িয়ে তারা নিয়ে চলে কোটরের পানে দল বেঁধে সার করে। তাদের এ বনে যেন লেগে গেছে 'পাঁচসালী যোজনা'। অকেজো লোকের জায়গা কোথায় তাদের ভেতর? কোথায় তাদের সময় একবার বর্ষা-ধোয়া ধোঁয়াটে নীল আকাশের পানে চেয়ে দেখবার, যেখানে দিক্‌চক্রবাল থেকে সাতরঙা রামধনু উঠে দূরের পাখা মেলা পাহাড়ের পানে মিলিয়ে গেছে?

একটা হরিণের দল শুধু সবুজ মখমল ঘাসের ডগাগুলো চিবিয়ে কাজ সারতে সারতে একবার থমকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে সেদিক পানে, আবার কাজ সারতে থাকে।

ভোঁ ও ও! মৌমাছিরা ঘুরে যায় মৌ নিয়ে নিয়ে। আবার আসে, আবার যায়। তাদের দল-বাঁধা কাজের চাপে মৌটুসি পাখিরা উড়ে যায়। ফুলের ভেতর কি বসার জো আছে মৌমাছিদের জ্বালায়? আর টুন গাছের ডালে গড়ে ওঠে মৌচাক। মৌমাছিরা মহা কাজের লোক! কত পরিকল্পনা

তাদের! চাক গড়া, মৌ জমানো, সমাজের উন্নতি, কত কী! সময় কোথায় তাদের রামধনুর রঙের পানে তাকাবার? আর রামধনু তখন ভেঙে ভেঙে সাতরঙা প্রজাপতি হয়ে বনে বনে ছড়িয়ে পড়ে—মহুয়া ফুলে, ঝুমকো, যুঁই, বক ফুলে ফুলে।

কর্কশ একটা কেকারব করে একজোড়া ময়ূর মাঠে নামল। আকাশে পেখম খুলে দিয়ে নাচতে লাগল ময়ূরটা। সুয্যি-ঠাকুরের পড়ন্ত লাল আভায় পেখমে পেখমে মরকত মণি ঝলসাতে লাগল। দূর পাহাড়ের মাথায় মেঘরাজ গোঁফ চুমরে উঁকি দিল একবার। আর নেচে উঠল প্রজাপতিরা রঙে বেরঙে—ঝুমকো, যুঁই ফুলে। কাঠবেড়ালিদের কাজ ভেঙে গেল। মৌমাছিরা প্রজাপতির ঝাঁকে দিশেহারা। ব্যস্ত কাকেরা লুকিয়ে রাখা খাবার খুঁজে পেল না। পিঁপড়েরা কিন্তু ঠিক জানে তার সুড়ুক। কুচকাওয়াজ করে তারা বয়ে নিয়ে গেল মৌমাছির পায়ে-ঝরা মৌ, ভুলো কাকেদের ভোলা খাবার আর কাঠ-বেড়ালিদের আধ-খাওয়া ফলপাকুড়। আরও কাজের লোক পিঁপড়েরা। ময়ূরের নাচ আর প্রজাপতির পাখনায় ভোলার লোক তারা নয়।

'ওঃ, ভারি তো প্যাখম!' বলে উঠল ক-জন কাঠবেড়ালি গিন্নি—'লাগে আমাদের চামর-দোলানো ঝুমরো ল্যাজের কাছে?—আর নাচ?'

কাঠবেড়ালি গিন্নিরা আকাশে ল্যাজের চামর দুলিয়ে নেচে উঠতে যাচ্ছিল, ধমকে উঠল কর্তারা—'কাজের সময় নাচ কী? আমরা ময়ূর, না প্রজাপতি?'

বনের মাথায় মাথায় ভেসে গেল লঙ্গুর বানরদের দল-বাঁধা ডাক—উকু-উ—উকু-উ—উকু-উকু-উকু!

গম্ভীর সন্ধ্যার পানে তাকিয়ে আরও গম্ভীর গলায় বুড়ো প্যাঁচা বলে উঠল, 'তিনে কত্তি তিন হাজার…'

কাঠবেড়ালিরা শুধোল, 'কিসের হিসেব হচ্ছে গো ?'

বুড়ো প্যাঁচা কানে কলম গুঁজে বলল, 'পড়ে ছিল তিনটে বীজ—হল তিরিশটা গাছ, তিন'শো ফুল, আর তিন হাজার ফল। মৌমাছি নিল মৌ, লঙ্গুরেরা খেল ফল আর কাঠবেড়ালিরা নিল বীজ।'

কাঠবেড়ালিরা বলল, 'কাজের লোক কাঠবেড়ালিরা।'

মৌমাছিরা বলল, 'কাজের দল মৌমাছিরা।'

'ক্যা ক্যা ?'—বলল কাকেরা—'কাকেদের মত কাজ-ভোলা কে ?'

পিঁপড়েরা বলল, 'কুচকাওয়াজ ! কুচকাওয়াজ !'

লঙ্গুরেরা এ বন থেকে পাঠিয়ে দিল কাজের খবর—উকু—উ উকু উ !

ময়ূর শুধু নেচেই খালাস, আর প্রজাপতি পাখায় পাখায় ফুর-ফুর।

বন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল ময়ূরদের, প্রজাপতিদের। রীতিমত সভা করে। এত কাজের লোকের ভেতর ওরাই শুধু নাচিয়ে কুঁদিয়ে ফুরফুর, বেপরোয়া, অসঞ্চয়ী। এত সমাজ উন্নয়ন—ভাগ বাঁটোয়ারার ভেতর ওরা বেহিসেবি নাচিয়ে, রঙিন রঙের হাল্কা বুদ্বুদ।

কাঠবেড়ালিরা বলল, 'অকেজো লোকের দাম নেই কোন। ওরা ফল বীজ কুড়িয়ে জমিয়ে রাখে না।'

মৌমাছিরা বলল, 'ওরা চাক বাঁধে না।'

পিঁপড়েরা বলল, 'ওরা কুচকাওয়াজ করে না।'

কাকেরা বলল, 'ওরা খাবার খুঁজে এনে লুকিয়ে হারিয়ে ফেলতে জানে না।'

লঙ্গুরেরা বলল, 'ওরা কাজের খবর বনে বনে ছড়িয়ে দিতে জানে না।'

আর হরিণেরা বলল, 'ওরা শুধু নাচে, আর হাওয়ায় হাওয়ায় ফুরফুরে রঙের রঙিন ফানুস ছিটিয়ে দেয়।'

তাই নির্বাসন হল ময়ূরের আর প্রজাপতির। আর কাজের লোকদের কাজ চলল পুরোদমে। সার্থক হয়ে উঠতে লাগল যোজনা। তবু কোথায় যেন কাজের তালে তাল কেটে যেতে লাগল, কোথায় যেন রঙের জালে রঙ গেল হারিয়ে। মেঘরাজ সৈন্যসামন্ত নিয়ে হুমকি দিয়ে হাসতে গিয়ে হারিয়ে ফেলল হাসি। ময়ূর আর নাচে না। একফোঁটা চোখের জল শুধু ঝরে গেল, বনের মাথায়। ঊনপঞ্চাশ পবনে ভর করে মেঘেরা উড়ে গেল, মহুয়া ফুলের রেণু ঝরে গেল। আর ঝুমকো, শিরিষ ফুল রঙিন প্রজাপতি না দেখে পরাগ ছড়ালই না আর। নাক-বাঁকা বকফুল খসে গেল। রামধনু নেই আর আকাশে।

তারপর একদিন দেখা গেল বনে আর ফুল নেই, শুধু ঝুলে আছে মস্ত একটা ঘণ্টার মত পোড়া লাল ঝুমকো ফুল। সেই প্রকাণ্ড বীভৎস ফুল দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল মৌমাছিরা। সবুজ মখমলের মত ঘাস শুকিয়ে গেল। শুধু যেখানে মেঘেদের একফোঁটা চোখের জল পড়েছিল সেইখানে একটা প্রকাণ্ড লম্বা ঘাসের শীষ আকাশের মহাশূন্যে মাথা তুলে দিয়ে বেতের মত লক-লক করে উঠল। হরিণেরা ঘাস খেতে এসে সেই প্রকাণ্ড লম্বা চাবুকের মত ঘাসের শীষ দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে বাঁচল।

গাছে ফল হল না। শুধু একটা প্রকাণ্ড জালার মত ফল হয়েছিল। লঙ্গুরেরা সে ফল দেখেই পগার পার। আর কাঠবেড়ালিরা সে ফলের বীজ নিয়ে যাবে কি, তার গায়ে লেগে সব উল্টে চিৎপটাং!

শুকনো বাকল-ওঠা শিরিষ গাছের কোটরে বসে ভর-সন্ধে বেলা বুড়ো প্যাঁচা হিসেবে ঢ্যাঁড়া দিল—'তিনে কত্তি এক···'

শুধোল মোমাছিরা, শুধোল কাঠবেড়ালিরা—'কী হিসেব হচ্ছে শুনি?'

কানে কলমটা গুঁজে বুড়ো প্যাঁচা বলল, 'পড়েছিল তিন হাজার বীজ—হল একটা ফুল, একটা ঘাস আর একটা ফল। এই ঢ্যাঁড়া।'

বুড়ো প্যাঁচার হিসেব শুনে কাজের লোকদের কাজ গুলিয়ে গেল।

কাঠবেড়ালি বলল, 'আমরা নাচব?'

কাক বলল, 'আমরা ফুরফুরিয়ে উড়ে যাব?'

পিঁপড়ে বলল, 'আমরা কুচকাওয়াজ ভুলে যাব?'

মৌমাছি বলল, 'গান গাইব আমরা?'

কিন্তু ময়ূর না হলে নাচ শেখাবে কে? প্রজাপতি না হলে কে উড়িয়ে দেবে রঙে রঙে রঙিন ফানুস? মেঘরাজের ক্ষ্যাপা সৈন্যসামন্তদের ভুলিয়ে জল করে দেবে কে? রামধনু ভেঙে সাতরঙা প্রজাপতি ছিটিয়ে কে দেবে?'

গম্ভীর গলায় হিসেবি প্যাঁচা বলল, 'একজোড়া ডিম।'

'ডিম! কোথায়? কার?'

দেখা গেল, সেই সবুজ ঘাসের শিষের নিচে একজোড়া ময়ূরের ডিম, আর ঝুমকো ফুলের কোরকে রেশমি জালে ঢাকা

একজোড়া শুঁয়োপোকা।

তারপর সেই ডিম থেকে আবার জন্ম নিল বনে ময়ূর। আর শুঁয়োপোকা দুটো একদিন গুটি কেটে প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেল। মরকত পেখম ছড়িয়ে নেচে উঠল ময়ূরেরা আবার একদিন। আর ঊনপঞ্চাশ পবনে ঈশান থেকে নৈর্ঋত, বায়ু থেকে অগ্নিকোণে ছড়িয়ে গেল মেঘরাজের গোঁফ-চোমরানো অট্টহাসি। মেঘেরা জল হয়ে গেল। ঝুমুর পরে বনের মাথায় এল বর্ষা। ঝুমকো লতায় দুলে উঠল ঝুমকো ফুল। তারার মত যুঁই ফুলে ভরে উঠল আকাশ। আর রামধনু ছড়িয়ে গেল দিকচক্রবাল থেকে দূর পাহাড়ের পাথায়। আর প্রজাপতিরা রামধনু রঙ মেখে ফুরফুরিয়ে ছিটিয়ে গেল।

বুড়ো প্যাঁচার কানে কলম গোঁজার অবসর নেই—'তিনে কত্তি লাখে লাখ...'

তিনতাল আর কাতলা

ঝিকিমিকি জল। পুব কোণে ঝিকিমিকি জলে শুয়ে-শুয়ে তিনটে তালগাছ কাঁপছে আর কাঁপছে—কত দিন, কবে থেকে। আরও কত ছায়া। গোলা ধানের মরাই, উড়ন্ত চিল, এক ঝাঁক শাদা পায়রা। ঝিকিমিকি জলে সবাই কেঁপে-কেঁপে ভেসে যায়, পড়ে-পড়ে কাঁপে। শুধু কোনদিন নিস্তব্ধ দুপুরে পৃথিবী যখন নিথর হয়ে যায়, দিঘির জল আয়নার মত ঝলসে ওঠে, তখন দেখা যায় সরলরেখা তিনটে তালগাছ ফিস-ফিস করে কথা বলছে নিঃশব্দে, পাছে চমকে ওঠে ঝিকিমিকি জল।

ফরফরিয়ে ফড়িং উড়ে যায় জল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে, শালুক ফুলে ফুলে মৌটুসি পাখির ভিড়। চিকিমিকি পুঁটিমাছ দিঘির ওপর জলে চমকে যায় আর বিদ্যুতের মত ছোঁ মেরে যায় সাতরঙা মাছরাঙা। কী বোকা ঐ পুঁটিমাছগুলো! ফিকে নীল জলে কাঁপা-কাঁপা ছায়া না দেখে কেউ কখনো খেলা করে বেড়ায়? শালুক পাতার নিচে কেমন শান্ত আরাম, ঝাঁঝিবনে পোকাটা মাকড়টাও পাওয়া যায়। আর জলের গভীর গভীরতা তো আছেই। প্রথমে ফিকে নীল, তারপরে কালচে সবুজ, তারও পরে অন্ধকার বেগুনি কালো। আর সেই বেগুনি কালো অন্ধকারের মাঝখান থেকে ছায়া দেখে কাৎলা মাছ। ঝাপসা নীল আকাশটা উপুড় হয়ে পড়েছে দিঘির জলে। ঐ কেঁপে কেঁপে ভেসে গেল তুলোট মেঘের পাঁজা। চিলটা ভাসছে, আর দূরে দিঘির কোন সুদূর কোণে যেন শিমুল ফুলের রাঙা ছায়া আয়না-জলে আবির গুলে দিয়েছে। কত রঙ! কত ছায়া!

ঐ তো একটা দু-পেয়ে মানুষের ছায়া পড়েছে জলে। চুপিসাড়ে এগোচ্ছে ছায়াটা। জলে সপাং করে কি যেন একটা আওয়াজ। ফড়িং-এর মত ঐ শাদা ফাৎনাটাও জানে কাৎলা মাছ। একটা মিষ্টি গন্ধ, আর কাঁপতে-কাঁপতে একটা পোকা ভেতরে নেমে আসছে ফিকে নীল ছাড়িয়ে, ভেদ করে কালচে সবুজ অন্ধকার বেগুনি কালো জলের ভেতর।

কাৎলা জানে দু-পেয়ে মানুষদের ছলাকৌশল। কিন্তু জানে কি ছোকরা রুইমাছগুলো? জানে কি দাড়িওয়ালা চাঁদা মাছেরা? গন্ধ পেয়েই তো ছুটেছে সব। কাৎলা তার প্রকাণ্ড শরীরটা একটু নাড়িয়ে নেয়। আবার একবার বুদ্ধির লড়াই হয়ে যাবে দু-পেয়ে মানুষের সঙ্গে। একটা উত্তেজনায় কাৎলার কানকোগুলো কাঁপতে থাকে।

ল্যাজের একটা সামান্য ঝাপটায় শরীরটা ঘুরিয়ে কাৎলা ওপরে উঠতে থাকে, আর যেখানে বোকা মাছের দল ভিড় করেছে সেখানে এসে লাগায় এক তাড়া। পুঁটিমাছের দল ফুরফুর। মানে-মানে কাহ্নিক মেরে সরে পড়ল দাড়িওয়ালা চাঁদা মাছেরা। ছোকরা রুইগুলো একটু রুখে দাঁড়িয়েছিল। তাদের দিকে ফিরে একটা গোঁৎ মারল কাৎলা। মুহূর্তের মধ্যে বঁড়শি-গাঁথা পোকাটার চারপাশ ফাঁকা।

ল্যাজ দিয়ে পোকাটাকে একটা ঝাপটা মারল কাৎলা, তারপরে সেটাকে বেড়ে ঘুরতে লাগল সে। আস্তে আস্তে বেড় ছোট হয়ে আসতে লাগল, তারপর হঠাৎ কপ করে পোকাটাকে গিলে ফেলল কাৎলা মাছ। সঙ্গে সঙ্গে তালুর ওপর একটা প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টান।

এই প্রথম টানটা চিরদিন ভয়ানক যন্ত্রণার। হঠাৎ দিশে-

হারা, পাগল করে দেয়। ভয়ের একটা ঢেউ এনে দেয় শরীরে। দিক্‌বিদিক ভুলে ছুট লাগায় কাৎলা। নীল আকাশের নিচে ছিপ বেজে ওঠে—কর্‌র্‌-র্‌-র্‌···। চিল চমকে ডাকে—কী কী, কির্‌কি কি! শাদা শালুকেরা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলে—হায়, হায়। তিনটে তালগাছের ছায়া ঝিকিমিকি জলে ঘন-ঘন কাঁপতে থাকে।

সামলে নেয় কাৎলা। এমন ভয় পেয়ে ছুটলে চলবে না। দম ফুরিয়ে গেলেই আস্তে আস্তে উঠে যেতে হবে। দু-পেয়ে মানুষের কাছে সে হার মানবে না। তার দীর্ঘ জীবনে এ অভিজ্ঞতা নতুন নয়। আর আজ তো সে জেনে-শুনেই দু-পেয়ে মানুষের লড়াইয়ের ডাকে সাড়া দিয়েছে। একবার দম নিয়ে কাৎলা দীর্ঘ দিঘির উত্তর কোণ লক্ষ্য করে জোর কদমে চলতে থাকে। ছিপ বেজে যায়—কর্‌র্‌-র্‌-র্‌···।

* * * * *

কবে সেই কোন্‌ ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায় কাৎলার। কী বড় তার এই জলাদিঘি! আর কত রকম আশ্চর্য দেশ দিঘির ভেতর! কোথাও ঝাঁঝির বন বিশাল ঘন, কোথাও সবুজ মরকত শ্যাওলার বাগান। কোথাও জলা-মাকড়সা জলের ভেতর পেতে রেখেছে তার রেশমি কাজ-করা জাল। তে-চোখো মাছগুলো ওপর জলে বেপরোয়া। ছটফটে খলসে পুঁটিরা তো আ [illegible] আটবাঁকা চিংড়িরা গম্ভীর চালে দাড়ি-ওয়ালা চাঁদা মাছেদের সঙ্গে গম্ভীরতার টেক্কা দেয়। চিতল মাছেরা খেলোয়াড় তাদের সঙ্গে ছুটে পারে এমন মাছ নেই। আর জলের ভেতর সুয্যিঠাকুরের সাতরঙ ভেঙে ছড়িয়ে হারিয়ে যায়।

সুয্যিঠাকুর কোথায় ? কত উঁচুতে ? এই তার ঝিকি-মিকি দিঘির ওপারে কি ? ছায়া পড়ে কত ! নীল, শাদা পায়রার ঝাঁক—চড়াই পাখির তীরের মত তির্যক গতি। সব ভেসে যায়। দিঘির পাড় তখনও ছায়াঘন হয়ে ওঠেনি। গোলা ধানের মরাইয়ের ছায়া তখনও পড়েনি দিঘির জলে।

একদিন জলে দেখা গেল কাদের যেন কটা ঝাঁকড়া মাথার ছায়া পড়েছে। অবাক হয়ে কাৎলা ভাবল, ওরা কে ? চিলের মত ভেসে বেড়ায় না, পায়রার মত পত-পত করে না, মাছরাঙার মত রঙের জোলুস তুলে ঝলসে দেয় না। কারা ওরা ? জলের ভেতর পড়ে পড়ে কাঁপে আর সুয্যিঠাকুরের দিক-বদলের সঙ্গে-সঙ্গে একটু একটু জায়গা বদলায় ?

দিন যায়। জলের ভেতর ঝাঁকড়া-মাথা ছায়াগুলো দীর্ঘ হতে থাকে। ক্রমে গাছের দেহগুলোর ছায়া জলে পড়ে।

কাৎলা শুধোয়, 'তোমরা কারা ভাই ?'

'আমরা তাল গাছ।'

'এতদিন কোথায় ছিলে ?'

'বা-রে, আমরা যে বাড়ছিলাম ! না বাড়লে কি জলের আয়নায় মুখ দেখা যায় ?'

কাৎলা শুধোয়, 'আর কে কে বাড়ছে গো ?'

তালেরা বলে, 'আমরা চারজন চৌতাল, ও কোণে একটা লিকলিকে আম গাছ, আর তার পাশে একটা ধানের মরাই।'

'ধান কী গো ?'

'ধান জান না ? ঐ দিঘির পাড়ে কাশের গোছা দেখছ—ধানেরা তাদের মামাতো ভায়ের মাসতুতো ভাই, ন্যাংটা ঘাসের মুকুট-পরা নাতির নাতি।'

'ধানেরা কোথায়?'

'ঐ তো মাঠের পর মাঠ ছাড়িয়ে আকাশের কোল ঘেঁষে।'

কাৎলা শুধোয়, 'তোমাদের দেশটা কি আমাদের দিঘির মত বড়?'

তালেরা হেসে ওঠে মাথা দুলিয়ে, 'কী যে বল! আমাদের এই পৃথিবী কত বড়, আর কী সুন্দর! কোথায় লাগে তোমার দিঘি!'

কাৎলার রাগ হয়ে যায়। মুখ ফিরিয়ে সে ডুব দেয় ফিকে নীল ছাড়িয়ে, ছাড়িয়ে কালচে সবুজ, বেগুনি, কালো অন্ধকারে। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। মনটা ছোঁক-ছোঁক করতে থাকে। কী আছে দিঘির ওপরে? কত বড়? কেমন?

মাকে ফাঁকি দিয়ে ওপর জলে উঠে আসে কাৎলার বাচ্চা, আর জলের ওপর শরীরটা দুমড়ে শূন্যে আকাশে লাফ দিয়ে ওঠে। উঃ কী গরমের ঝলকা! কিন্তু কী নীল আর সবুজ আর সোনালি!

হেসে ওঠে তালের বাচ্চারা চৌতালে।

* * * *

কাৎলার মুখের টানটা আলগা আর হয় না। সোজা ছুটতে ছুটতে তীব্র গতিতে বাঁক নেয় সে। কিন্তু ছিপের সুতো সঙ্গে-সঙ্গে টান হয়ে গুটোতে থাকে। কাৎলা আবার বাঁক নিয়ে ছুটে চলে। আচ্ছা দেখা যাক এ লড়াইয়ে কে জেতে কে হারে। এখনও সে জানে দু-পেয়ে মানুষের ছিপকে ফাঁকি দেবার আসল কৌশল।

* * * *

সেই প্রথম ছিপে গাঁথার কথা মনে পড়ে যায় কাৎলার।

তালেদের মাথা ছাড়িয়ে সেদিন আকাশের নীল চোখে জল জমেছিল। ধানের মরাই বড় হয়ে উঠেছে, আর তার মাথায় উঠেছে সবুজ একটা লাউডগা। লিকলিকে আম গাছ ভারি হয়ে ডালপালা ছড়িয়ে ঝুঁকে পড়েছে দিঘির বুকে। সেখানকার দিঘির জল কেমন ঠাণ্ডা, সোঁদা-সোঁদা ! ঝমঝম করে বৃষ্টি দিঘির বুকে টুপুর-টুপুর নূপুর পরে নাচতে শুরু করে দিল। আর কি নিচে থাকা যায় ?

ওপরে উঠে আসতে আসতে কাৎলা দেখল, জলের ভেতর একটা মিষ্টি পোকা আস্তে আস্তে নেমে আসছে। ভাগ্যে বৃষ্টি, তাই খবর পায়নি দাড়িওয়ালা চাঁদা মাছেরা, গুণ্ডা রুইগুলো ! একলাফে গিলে ফেলল পোকাটাকে কাৎলা মাছ। আর সঙ্গে-সঙ্গে সে কী প্রচণ্ড টান ! ভয়ের একটা শিহরণ খেলে গেল কাৎলার শরীরে। দিক্‌বিদিক হারিয়ে ছুটল সে। কিন্তু ছিপ বেজে চলেছে এক তালে—কর্‌র্‌-র্‌-র্‌।

তালেরা কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'আস্তে, আস্তে, কাৎলা মাছ ; ভয় পেওনা।'

হাঁপাতে হাঁপাতে কাৎলা বলল, 'ভয় না-পেলেই হল ? আটকে গেছি যে !'

'কোথায় ?' তালেরা শুধোল।

'মুখের দিকে।'

'আমরা ভয় পাই না। আমরাও তো আটকে গেছি পায়ের দিকে।'

'তোমাদের ভয় কিসের ?'

'আছে গো, আছে। বর্ষা-ঠাকুরের বাজের ভয়। তাই বলে কি আমরা ভয় পাই ? মাথা উঁচু করে আকাশে যে লাফিয়ে

উঠতে পারে, কিসের ভয় তার ?'

আর সোজা ছুটতে-ছুটতে খুব জোরে একটা উল্টো বাঁক নিয়ে আকাশে লাফিয়ে উঠল কাৎলা। ছিপের সুতো আলগা হয়ে গেল এবং পরমুহূর্তে আওয়াজ হল—পটাং! ছিঁড়ে গেছে ছিপের সুতো।

সেই কৌশল ভোলেনি কাৎলা।

* * * *

কিন্তু এবার যেন দু-পেয়ে মানুষটা বড় পাকা খেলোয়াড়। ছিপের সুতো আলগাই হচ্ছে না। কাৎলা তিন-তিনবার বাঁক নিয়েছে, মুখের বাঁধনে কিন্তু সমান টান। শরীর বড় ভারি হয়ে গেছে। শরীর ভারি হলেই মন ভারি, আর মুখ হাঁড়ি।

মন ভারির কথায় মনে পড়ল।

গোলা ধানের মরাইয়ের মাথা থেকে ঝুলে দুলছিল লাউয়ের ছানা। মুখে তখনও লেগে আছে হাসির ফুল।

কাৎলা শুধোল, 'কী ভাই লাউয়ের ছানা ?'

'কী ভাই কাৎলা !'

'কবে এলে ?'

'এলুম প্রজাপতির পাখায়, আর মোটুসির পিঠে। দেখেছ রোদ্দুর কী মিঠে !'

কাৎলা বলল, 'দূর! রোদ্দুর কি মিঠে হয় নাকি ? মিঠে হল জল। ঠাণ্ডা জল, কালো—নীল !'

চৌতাল বলল, 'মিঠে হল তালশাঁস।'

আমগাছ বলল, 'সবচেয়ে মিঠে দাড়িওলা আম।'

কাৎলা হেসে বলল, 'সবচেয়ে মিঠে পোকা।'

রাগে ফুলতে ফুলতে লাউয়ের ছানা বলল, 'কী বোকা !'

আর সেই যে ফুলতে লাগল লাউয়ের ছানা—একদম ভারি হয়ে গেল। হাসি নেই, কথা নেই, একদম গোমড়া-মুখো হুম্।

আর একদিন শানাই বেজে উঠল দিঘির পাড়ে। লাউ-কর্তাকে কেটে নিয়ে দু-পেয়েরা ধেয়ে গেল। জলে পড়ল জাল।

সে কি কম বিপদ গেছে ?

দিঘির এ-কোণ থেকে ও-কোণ ছেয়ে জাল এগিয়ে আসছে। মাছেরা সব পালাচ্ছে জালের মুখে। কিন্তু যাবে কোথায় ? শুধু মন ভারি নয় যাদের তাদেরই রক্ষে।

'ও ভাই চৌতাল, এবার ?' কাৎলা ডাকে।

তালেরা বলে, 'মন ভারি কোরো না। বর্ষাঠাকুরের বাজ তো ডাকেনি, তবে আকাশে লাফ মারতে ক্ষতি কী ?'

আর জাল টেনে টেনে যখন দিঘির পাড়ে এসে গেল, জাল ডিঙিয়ে কাৎলা মারল লাফ। নিমেষে ডুব। ফিকে নীল ছাড়িয়ে, ছাড়িয়ে কালচে সবুজ, বেগুনি-কালো অন্ধকারে।

*   *   *   *

কর্কশ আওয়াজে ছিপ বেজে উঠল। কাৎলা এবার টানা ছুট মেরেছে প্রাণপণে। আর তীরের মত সোজা যেতে যেতে ল্যাজের এক মোচড়ে বিদ্যুতের মত উল্টো বাঁক নিল। এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ঘটে গেল, যে কাৎলার মানুষ প্রতিদ্বন্দ্বী টান রাখতে পারল না। ছিপের সুতো আলগা হয়ে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে কাৎলা মারল লাফ। সেই হ্যাঁচকা লাফে আলগা সুতো টান হয়ে পটাং করে ছিঁড়ে যেত, কিন্তু দু-পেয়ে মানুষটাও কম খেলোয়াড় নয়। নিজের ভুল বুঝতে পেরে এবং কাৎলা কী করবে যেন জেনেই সে অনেক সুতো আলগা দিয়ে রেখেছে। কাজেই সুতোয় আর হ্যাঁচকা টান লাগল না, সুতো ছিঁড়ল না।

কাৎলা জলে পড়তেই আবার সুতো টান হয়ে গেল।

কাৎলা হাঁপাতে লাগল। তার দম শেষ হয়ে আসছে। দেহ ভারি, মন ভারি হয়ে এল।

* * * *

মন ভারি না-হয়ে পারে?

কালবোশেখ। ঊনপঞ্চাশ পবনে চড়ে এলেন মেঘরাজ। কালো হয়ে গেলেন সুয্যিঠাকুর, আর ভ্রূকুটি-করা আকাশের কালো চোখ থেকে ঠিকরে এল বাজ তালের মাথায়।

* * * *

সেই তিন তাল দিঘির জলে কালো ছায়া ফেলে কাঁপছে। হুইল গুটোনো হচ্ছে। লাল-হয়ে-আসা পশ্চিমে বাদুড়েরা পাখা চালিয়েছে সাঁই সাঁই। কাৎলা সুতোর টানে টানে এগিয়ে আসছে একটু একটু করে। চোখে তার পরাজয়ের দৃষ্টি।

'এবার তিন তাল!'

তিনতাল বলল, 'পৃথিবীটা একবার দেখে যাও কাৎলা মাছ।'

আর কাৎলা মাছ হালকা শরীরে হাল ছেড়ে উঠে আসতে লাগল। পার হয়ে বেগুনি কালো অন্ধকার, পার হয়ে কালচে সবুজ, ফিকে নীল জলে যেখানে সবুজ ঘাস আর ঝিকিমিকি জল মিলতে শুরু করেছে।

কাৎলা আর খেলছে না, উঠে এসেছে একেবারে পাড়ে। ছিপটায় টান রেখে দু-পেয়ে মানুষটা জলে নেমে এসেছে। পা-দুটো তার উত্তেজনায় কাঁপছে। কাৎলার মাথাটা কে চেপে ধরেছে। এত হাওয়া! হঠাৎ দেহটা ধনুকের মত বাঁকিয়ে সজোরে একটা ঝটকা মারল কাৎলা মাছ। ঝপাং-ঝপাং করে

দুটো শব্দ হল জলে। কাৎলা আর মানুষ দু-ই জলে। কিন্তু কাৎলা কোথায়? শালুক পাতার থালায় বেড়ে বেড়ে ঢেউ গোল হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। শাদা শালুক ফুলে ফুলে মৌটুসিরা তখনও পাখার গান শোনাচ্ছে।

তিন তাল আকাশে হাত তুলে নিথর। কিন্তু দিঘির ঝিকি-মিকি জলে ছায়া তাদের কাঁপছে। আজও কাঁপছে।

খুব বেঁচে গেছি

এইমাত্র ঝুম-ঝুম করে এক-পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া কালো মেঘ ভরা চাঁদের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে। চাঁদ যেন লুকোচুরি খেলছে মেঘেদের সঙ্গে। একবার লুকিয়ে পড়ছে কালো মেঘের ভেতর, আবার একটুখানি মুখ বার করে বলছে—'টু'! তালপুকুরের পাড়ে তালগাছগুলো পাঁচ আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে—ওই, ওই!

চাঁদ বলছে—'টু!'

তালপুকুরের জলে পড়ে শিরশিরিয়ে কাঁপছে লম্বা লম্বা তালের ছায়া, দুষ্টু মেয়ের মত চাঁদের খলখলে হাসি, আর শান্ত আলো-মাখা সমস্ত নীল আকাশ। তালপুকুরের জল থেকে উঁকি মেরে অবাক হয়ে আকাশে চেয়ে আছে একটা সদ্য-শাদা শালুক ফুল। ফুলটার পাশে জলে ভাসা থালার মত শালুক পাতাটার ওপর একফোঁটা বৃষ্টির জল তখনও মুক্তোর মত টলটল করছে।

হুস্ করে হঠাৎ জলে ঢেউ তুলে একটা সোনা ব্যাঙ লাফিয়ে শালুক পাতাটার ওপর উঠে বলল, 'উঃ, খুব বেঁচে গেছি!'

তালপুকুরের পাড় দিয়ে পাতা-ঝরা ঘাসের ভেতর দিয়ে পিছলে সড়্‌সড়িয়ে মিলিয়ে গেল একটা সাপ।

সারাটা গ্রীষ্মের পর মাঠ ঘাট পুকুর যখন জিভ-বার-করা কুকুরের মত হা হা করে হাঁপায়, সেই সময় যখন আকাশের ঈশাণ কোণ থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশ কালো করে

শিঙ নেড়ে নেড়ে ছুটে আসে মেঘের পাল, কার না মন খুশিতে ভরে ওঠে? পাঁচ হাতে হাততালি দেয় তালগাছেরা, বুড়ো বটও ঝলমলিয়ে ওঠে খুশিতে। কোটর থেকে মুখ বার করে বৃষ্টি ঝরা দেখে কাঠবেড়ালির বাচ্চা। মাছরাঙা আর শালিক আর দোয়েল চুপচাপ খুশি মনে প্রাণ ভরে ভেজে। ছাতারে পাখিদের ছাতা নেই। কে তখন চায় ছাতা? আর ব্যাঙেরা ফুর্তি না চাপতে পেরে হেঁড়ে গলায় গান জুড়ে দেয়।

শালুক পাতার ওপর সামলে-সুমলে বেশ আসন জুড়ে বসে সোনা ব্যাঙ ভায়া গানের মহড়া ছাড়ল—গ্যাঙ গ্যাঙ গ্যাঙোর গ্যাঙ!

অমনি এপাড় ওপাড় থেকে ধুয়ো উঠল—গ্যাঙ গ্যাঙ গ্যাঙ!

ব্যাঙেরা কিন্তু অমনি খুশি মনে 'রামা হো' বলে কানে হাত চাপা দিয়ে গেয়ে ওঠে না। কানই নেই, তার কানে হাত চাপা দেবে কী!

ওপাড় থেকে একটা কোলা ব্যাঙ বলে, 'কী গান গাইবে দাদা আজ?'

সোনা ব্যাঙ জবাব দেয়, 'খুব বেঁচে গেছি!'

ব্যাঙেদের গান ব্যাঙেরাই বোঝে।

সোনা ব্যাঙ গান জুড়ে দেয়—

'তখনও এ তালপুকুর জন্মায় নি। মাঠে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াই। সুয্যিঠাকুরের তাপে মাঠ বাদাড় সব শুকনো। জল —জল নেই কোথাও। ব্যাঙেদের ডিম হবে কোথায়? কোথায় ফুটবে ব্যাঙাচি-বাচ্চা? লাফাতে লাফাতে ঘুরি ফিরি, কোথায় পাওয়া যায় একটু জল! এমন সময় ঘুরতে ঘুরতে দেখি, তালগাছের তলায় খোঁড়া হচ্ছে এই তালপুকুর।

মানুষদের কলম্বস নাকি আমেরিকা খুঁজে বের করেছিল। ব্যাঙেদের তালপুকুরের চেয়ে কি সেটা বড় ?'

পুকুর-পাড়ের ব্যাঙের দল গানের ধুয়ো তোলে—'গ্যাঙ গ্যাঙ গ্যাঙোর গ্যাঙ !'

সোনা ব্যাঙ গেয়ে চলে, 'তালপুকুরে বাসা করলাম, ডেকে ডেকে খবর দিয়ে বেড়ালাম ব্যাঙেদের। লিখন পাঠিয়ে দিলাম পরগনা পরগনা। এল সোনা ব্যাঙ, এল কুনো ব্যাঙ, কোলা ব্যাঙেরাও এল।

তালপুকুরে তখনও মাছেরা বাড়ে নি। তবু দু-বেলা ছিপ পড়তে লাগল। মাছরাঙারা রামধনু ঝিলিক মেরে ছোঁ মেরে যেতে লাগল জলে।

একদিন। তখন অমাবস্যার কালো রাত। পুকুর-পাড়ে ঘাসের ভেতর বসে দুটো পোকাটা-মাকড়টা হজম করছি। ওমা, হঠাৎ শুনলাম দুটো মানুষ বলছে, ঐ দেখ ঘাসের ভেতর মানিক জ্বলছে !

বুক শুকিয়ে গেল ! মানিক কোথায় ? ও তো আমার চোখ ! ব্যাঙেদের চোখ কি অন্য জানোয়ারের মত ছোট-ছোট ? আমাদের মস্ত চোখে একটু আলো পড়লেই মানিকের মত জ্বলে, তাই মানুষে বলে ব্যাঙের মাথায় মানিক আছে।

মানিক তো কী ? মানিক কি খাওয়া যায় ? তবু মানুষ-গুলো মানিক দেখলেই ক্ষেপে যায়। তাড়া করল লোকদুটো আমাকে। ব্যাঙেরা যদিও খুব ছুটতে পারে, তবু ধরে ফেলল তারা আমাকে। ধরেই চেঁচিয়ে উঠল, আরে, মানিক কোথায় গেল ?

একজন বলল, ব্যাঙটা লুকিয়ে ফেলেছে !

মার আছাড় ! আর-একজন জবাব দিল।

না রে, ছেড়ে দে ! আগের লোকটা বলল,—ওর পেছনে পেছনে গেলেই মানিকটা খুঁজে পাওয়া যাবে।

ছেড়ে দিতেই আর সেখানে দাঁড়াই ? এমন লাফ আমি জীবনে দিই নি ! একলাফে একেবারে টুপ করে তালপুকুরে ডুব। খু-উ-ব বেঁচে গেছি।'

পাড়ের ব্যাঙের দল জোর গলায় গানের ধুয়ো ধরে নিল— 'খু-উ-ব বেঁচে গেছি।'

'ব্যাঙেদের জীবনে কি স্বস্তি আছে ? সেবার কোথা থেকে এল একটা বক। তালপুকুরের জলে এক ঠ্যাং ডুবিয়ে বসে থাকত বকটা, আর সেখান দিয়ে কোন ব্যাঙ গেলেই সুড়ুৎ করে চলে যেত বকের মুখে।

এমনি সেদিন আমার খেয়াল নেই যে বকটা বসে আছে। আমি একটা পোকাকে লক্ষ্য করে তাড়া করেছি। হঠাৎ খপ্ করে এক ঠ্যাঙে ঝুলতে ঝুলতে বকটার মুখের ভেতর উঠে যেতে লাগলাম। ভাগ্যে সেই সময় একটা মানুষের বাচ্চা বকটাকে টিপ করে একটা ঢিল ছুঁড়েছিল ! খু-উব বেঁচে গেছি !

আর একদিন।

মানুষদের বাড়িতে সেদিন ইনিয়ে বিনিয়ে সানাই বেজে চলেছে। তালপুকুরের কোণের মাচাটা থেকে জলের ওপর ঝুলে পড়েছে একটা লাউয়ের ছানা! জলের ভেতর থেকে লাউয়ের ছানাটাকে বেশ ডাগর-ডোগর দেখাচ্ছে। হঠাৎ দেখি আমার মুখের সামনে দিয়ে একটা কেঁচোর বাচ্চা কাঁপতে কাঁপতে নেমে আসছে। আর কথা আছে ? খপ্ করে গিলে

ফেললাম কেঁচোটাকে। ও মা! সঙ্গে-সঙ্গে মুখে একটা কাঁটা বিঁধে গেল, আর একটা প্রচণ্ড টানে ছিপের সুতোয় আটকে আছড়ে ডাঙায় পড়লাম।

মানুষগুলো প্রথমে হৈ-হৈ করে উঠেছিল, তারপরে বললে, ধ্যেৎ, একটা ব্যাঙ!

একজন বলল, ব্যাঙ ভাজা খেতে মজা।

আমার তো তখন প্রায় হয়ে গেছে!

কী জানি ছিপওয়ালা লোকটা কি মনে করে বঁড়শি থেকে খুলে ছুঁড়ে আমাকে তালপুকুরে ফেলে দিল।

খু-উব বেঁচে গেছি!'

পাড়ের ব্যাঙেরা দল বেঁধে গানের ধুয়ো ধরল—'গ্যাঙ গ্যাঙ গ্যাঙ!'

মেঘেরা দখিন বাতাসে পাল তুলে দিয়েছে। আকাশে হাসছে চাঁদ আর জলে শালুক ফুল।

সোনা ব্যাঙ শালুক পাতায় বসে আবার গেয়ে উঠল, 'ব্যাঙেরা সব সাবধান! সাপ এসেছে তালপুকুরে! বড় পাজি সাপ! ব্যাঙ দেখলেই খেয়ে ফেলে। বক নয় যে উড়ে যাবে, মানুষ নয় যে ছেড়ে দেবে। এই তো আজকেই ফাঁকি দিয়েছি সাপকে।

ব্যাঙের বুদ্ধির কাছে সাপ? আমাকে সাপটা যেই তাড়া করল, লাফের পর লাফ! এক ডুবে তালপুকুর পেরিয়ে এই শালুক পাতায় বসে গান গাইছি। খুব বেঁচে গেছি!'

দল ধুয়ো ধরছিল—এমন সময় হঠাৎ শালুক পাতাটার নিচে কি যেন নড়ে উঠল। উল্টে গেল পাতাটা, আর সড়াক

করে সোনা ব্যাঙ চলে গেল সাপের মুখে।

জলঢোঁড়া ব্যাঙ মুখে করে সাঁতরে যেখান দিয়ে চলে গেল জল সেখানে শির-শির কাঁপতে লাগল। আর সেই কাঁপা-কাঁপা জলে নাচতে লাগল চাঁদের ছায়া, আঁকাবাঁকা তালগাছ আর একশোটা শালুক ফুল যেন।

জমি

একটা নিম গাছ আর একটা ডুমুর গাছ। ডুমুর গাছটা আকাশে পাঁচ আঙুল মেলে দিয়ে হা হা করে হাসে। নিম গাছের সাজানো সবুজ চুলের রাশ গোছা-গোছা করে কাটা হতে থাকে।

একটুখানি রোদ—রোদ চাই একটু। চারিদিকে উঁচু উঁচু বাড়ির সার, মাঝখানে একফালি জমি, আগাছায় ঢাকা। শুধু কেমন করে একসঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটা নিম আর ডুমুর গাছ অভিমন্যুর ব্যূহর মত বাড়ি-ঘেরা টুকরো জমিটায় মাথা তুলে দেখা দিয়েছিল কেউ জানে না। তারপরে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠেছে নিম আর ডুমুর গাছ। জমিটুকুতে ফসল ফলে না কারণ নিম গাছের এলানো চুলের রাশ ভেদ করে আর ডুমুর গাছের পাঁচ আঙুলের থাবা ডিঙিয়ে শহুরে সুয্যিঠাকুরও জমিটায় পৌঁছতে ভয় পান। নিমগাছের এলো চুলের গোছা তাই কাটা হতে থাকে, কারণ জমিতে রোদ চাই—ফসল ফলাতে হবে।

ডুমুর গাছটা হা হা করে হাসে, কারণ এইবার বেড়ে-ওঠায় সে হারিয়ে দিতে পারবে নিমগাছটাকে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন ডুমুরের ডালগুলো পেঁচিয়ে কাটা হয়ে যায়। গুঁড়িটা শুধু বর্ষার মুখ চেয়ে ধুঁকতে থাকে। রাতের শহুরে চাঁদ ফ্যাকাশে মুখে জমিটার দিকে চেয়ে হেসে ওঠে। এবার বোধহয় আফলা ঘুমন্ত জমিটা সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জেগে উঠবে।

চড়ুই পাখিরা অবাক! এ আবার কী কাণ্ড? কাকদের

কিন্তু মহা আপত্তি। গাছের যদি ডালপালা ছাঁটা হয় তাহলে তারা বাসা বাঁধবে কোথায়? কাকেরা তাই দল বেঁধে-বেঁধে কা কা করে দু-পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে, ঠিক যেন আইন অমান্য—চলবে না! চলবে না!

পল্টুর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। পরীক্ষার পর কত ছুটি! জমিটায় ফসল সে ফলাবেই। কুমড়ো আর শশা আর নটে-শাক। জমিটা খোঁড়া হতে থাকে। আগাছার দল কচুকাটা। জমির নিচে থেকে মেঠো ইঁদুর-গিন্নি ছানাপোনা নিয়ে ছুটোছুটি করতে থাকে। কী বিপদ বাপু! কাকেদের মত দল থাকলে সেও নেচে-নেচে ঘুরে বেড়াতে পারত—চলবে না! চলবে না! কিন্তু কাকেদের মত ইঁদুরেরা তো উড়তে পারে না, লাঠির ভয় আছে।

'ব্যাপার কী?' ইঁদুর-গিন্নি শুধোয় চড়ুইদের।

'বুঝছ না? চড়ুই-গিন্নি জবাব দেয়, 'খাবার, খাবার! নটেশাক!'

'ছোঃ, নটেশাক! বলি, আর কিছু হবে?'

'হবে বৈকি!' কুমড়ো, শশা, লাউ আর নটেশাক।'

'আ হা হা!' ইঁদুর-গিন্নি বলে, 'শস্তা হবে তো?'

'হবে না?' চড়ুই-গিন্নি জবাব দেয়, 'কত বীজ দিল পল্টু দেখছ না? কচি-কচি চারাগুলো বেরোবে, আর চড়ুইয়েরা দল বেঁধে এসে পেড়ে-পুড়ে খেয়ে যাবে। কী শস্তা, একেবারে যাকে বলে বিনা-পয়সায়! তাই তো চড়ুই ঘেরা-বাড়ির ঘুলঘুলি ছেড়ে বাগানের ফোকরে বাসা বেঁধেছে। কাচ্চা-বাচ্চা খেয়ে বাঁচবে।'

'খবরদার!' ইঁদুর-গিন্নি গর্জে ওঠে, 'কচি চারা খাওয়া চলবে না! তাহলে কুমড়ো হবে ক্যামনে? শশা কী করে হবে? ইঁদুরদের বাচ্চারা খাবে কী?'

'কচি চারার ডগা না হলে চড়ুইদের বাচ্চারা খাবে কী?'

একটা মোটা-সোটা কষ্টি-কালো কাক-গিন্নি আর থাকতে না পেরে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ! চড়ুইদের মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চা না হলে কাকেদের চাটনি হবে কী করে?'

'মর! মর!' বলতে বলতে চড়ুই-গিন্নি হাওয়া। ওলটানো পালটানো জমির নিচে থেকে বাসা বদলাতে-বদলাতে একটা ঢোঁড়া সাপ বিনা কানে ইঁদুরদের বাচ্চার কথা কানে শুনে রাখে।

চৈতালি রোদে পোড়া জমিটা যখন হাঁপাচ্ছিল, হঠাৎ আকাশ ছেয়ে পাগলা মোষের দলের মত ঝাঁপিয়ে আসে কাল-বোশেখী। হাততালি দিয়ে ওঠে কচি কুমড়ো আর শশা আর নটেশাকের চারাগুলো। নটেশাকের ঝাঁকে বেদুইন আরবের মত চড়ুইয়ের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের তাড়িয়ে বেড়ায় ইঁদুর-গিন্নি। কবে হবে শস্তার কুমড়ো আর শশা?

ঝোড়ো কাকেরা টেরিয়ে চায়। কবে হবে চড়ুইদের বাচ্চা?

ঢোঁড়া সাপ বুক টিপে-টিপে এগিয়ে দেখে, কবে হবে ইঁদুরদের বাচ্চা।

পল্টু মহা খুশি। কুমড়ো-ফুল বাগান আলো করে হলদে হাসি হেসে উঠেছে। লাল নটে লালে লাল। এঁকে-বেঁকে শশা গাছে জোর লেগেছে। গেলই বা কিছু চড়ুইদের পেটে। খেলই বা দুটো ইঁদুর-গিন্নি।

আর দেখা দেয় ডুমুর গাছে কচি পাতা আর শুঁয়োপোকার দল। নিমের ডালে সবুজ পাতার রাশ ছেয়ে যায়। শাদা নিম ফুলের গুঁড়ো চাঁদের আলো মেখে ঝরে পড়ে। কোথায় যেন আমের বোলের গন্ধ আর পাগলা কোকিলের বাউল ডাক।

তারপর ঝুমুর পরে নামে বর্ষা। আকাশে মাদল বাজাতে থাকে। শুঁয়োপোকারা কবে গুটি থেকে প্রজাপতি হয়ে রামধনু রঙে উড়ে যায়। বাগানে শশা ফলে, আর কুমড়োগুলো নাদা পেটে ফুলে ওঠে।

চড়ুইদের বাসায় গুণ্ডা কাকেরা হামলা করে। ইঁদুর-গিন্নি রাতের অন্ধকারে কুমড়ো আর শশায় ভাগ বসায়। সেই ফাঁকে ঢোঁড়াসাপ ছুটো ইঁদুরের বাচ্চাকে আসে সাবাড় করে।

চাঁদ মিটি-মিটি হাসে।

পল্টুর ছুটি শেষ।

সুয্যিঠাকুরকে আগলে নিম গাছ তার এলো চুল মেলে দেয়। বাগানে রোদের ছায়াটুকুও নেই। ডুমুর গাছের গুঁড়ি থেকে পাঁচটা আঙুল আকাশে থাবা মেরে ওঠে। আগাছার দল ভিড় করে জমিতে। অযত্নের রুপোর কাঠির ছোঁয়ায় জমি আবার ঘুমিয়ে পড়ে।